বুড়ো মানুষ – একদিন প্রতিদিন

বুড়ো মানুষ-একদিন প্রতিদিন

অপরাজিত বসু

বেস্টবুক্স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

লেখকের কথা

চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির কারণে আমরা আজকাল বেশি দিন বাঁচি, উর্ধ্বায়ুর সীমানা বাড়ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তো বটেই, এমনকি আমাদের মতো গরীব তৃতীয় বিশ্বে গড় আয়ু বাড়ছে — ভারতে গড় আয়ু প্রায় ষাট বছর। বার্ধক্য শুধু স্মৃতি রোমন্থনের জীবনস্তর নয়, বার্ধক্য সৃষ্টিশীল স্তরও হতে পারে যদি স্বাস্থ্য — বিশেষ করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। এ কাজ সহজ নয়। এর জন্য যেমন একদিকে শরীর-স্বাস্থ্য-ব্যাধি প্রসঙ্গ আমদের জানার পরিধির মধ্যে আনা চাই তেমনি মানসিক অবস্থানকেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার কৌশল জানা চাই। বৃদ্ধ মানুষের জীবনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে সহজভাবে কিছু আলোচনা করেছি। ভঙ্গীটা হালকা হলেও বিষয়টা মোটেই হালকা নয়। যাঁরা বয়স্ক তাঁরাই যে শুধু এই বই পড়বেন তা নয় — এ বই সবার জন্য, বিশেষ করে যাঁরা যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের পথে যাত্রা শুরু করেছেন তাঁরাও এই বইয়ের মূল কথাগুলিকে গ্রহণ করবেন — এই আশা করি।

সূচী

লেখকের অন্যান্য বই

স্বাগতম, হ্যালির ধূমকেতু
আবহাওয়া ও আমরা
কলকাতা, ৩০০ বছরের বিজ্ঞানচর্চা

বুড়ো মানুষ – একদিন প্রতিদিন

কথায় বলে – কানু বিনা গীত নাই। গীতের মধ্যে কানুর কথা ঘুরে ফিরে আসার মতই বুড়োদের আড্ডায় অসুখ-বিসুখ আর পরিবার-পরিজনের কথা শোনা যাবে। মাঝে মাঝে টিকা-টিপ্পনি জুড়ে অন্য পাঁচটা কথা হয় – আলোচনা রাজনীতি, ধর্মকর্ম, গুরু থেকে শুরু করে মিঠুন, অমিতাভ বচ্চন অবধি গড়ায় বৈকি। তবে তাতে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। লক্ষ্য করবেন, বুড়োরা কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে পারতপক্ষে কথা বলে না। তা হলো – মৃত্যু।

বুড়িদের আসরগুলি কেমন? পার্কের বেঞ্চিতে কিংবা মর্নিং-ইভনিং ওয়াকের মাঝে বুড়োদের আসরগুলি যেমন জমে, বুড়িরা কি সেরকম আড্ডা জমায়? সেরকম না হলেও তারা কিছুটা এবাড়ি ওবাড়ি করে। সুখ দুঃখের গল্পও হয়। লক্ষ্য করা গেছে – বুড়িরা কিন্তু বুড়োদের মতো জীবন সম্পর্কে অতটা হতাশ নয়।

বুড়োরা সাধারণভাবে পরস্পরের সম্পর্কে নিরাসক্ত, বুড়িদের বেলায় ততটা না হলেও আগ্রহের অনটন আছে। তারা নিজেদের পরিবারের মানুষজন সম্পর্কে যতটা মনস্ক ততটাই অর্ধমনস্ক বাকিদের সর্ম্পকে। বৃদ্ধ দম্পতিরা পারস্পরিক টানে অনেক সময় তরুণ দম্পতিকে হার মানায়। এ নিয়ে বিমল করের একটি অসাধারণ গল্প আছে।

তরুণ এক দম্পতি এসেছে পশ্চিমের একটি শহরে, বায়ু পরিবর্তন করতে। ঘটনাক্রমে সেই অস্থায়ী বাসাতে আছেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। বয়সের উচ্ছলতায় এবং উপদ্রবজ্ঞানে তরুণ দম্পতি প্রথম থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সম্পর্কে বিরাগ। তারা নিজেদের নিয়েই মেতে থাকে। বেড়ায়, গান গায়, খুনসুটি করে। ক্রমে

তাদের নজরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পারস্পরিক আশ্রয়, সান্ত্বনা ও ভালবাসার দিকগুলি ধরা দিল। বুড়োর ঠান্ডা লাগবে বলে বুড়ি সন্ধ্যাবেলায় মাফলার জড়িয়ে দেয়, বুড়ির বাতের জন্য বুড়োর কি উদ্বেগ। গভীর নির্ভরশীল ভালবাসা তরুণ দম্পতিকে আচ্ছন্ন করে দেয়, প্রেমের শাশ্বতরূপকে তারা আবিষ্কার করে।

বুড়ো মানুষদের নিয়ে এতরকম সমস্যা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়–বার্ধক্য নিজেই একটা সমস্যা, না বার্ধক্যের সঙ্গে সামাজিক-পারিবারিক সমস্যাগুলি নতুন চেহারা নিয়ে এসে বার্ধক্যজনিত সমস্যাকে তৈরি করে ?

বার্ধক্যের ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তবে লক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলা যায়। লোলচর্ম, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি স্তিমিত, শারীরিক ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান, আধি-ব্যাধির ঘন ঘন আক্রমণ – এসবই বার্ধক্যের লক্ষণ। বুড়োটে দেখালেও সত্যি বুড়ো হবে – এমন কথা নেই। যেমন আমাদের পাড়ার শীতলদা, মানে শীতল রায়।

শীতল রায় ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। মাথার চুলগুলো কালো, পঞ্চাশ পার হলেও বেশ ঘন আছে। জোরে জোরে কথা বলেন, সোজা বসেন, হাঁটেন। পিছন থেকে দেখলে চট্ করে বোঝা যায় না যে শীতল রায়ের বয়স হয়েছে। সামনে থেকে ভালো করে দেখলে গলার ভাঁজ, চোখের নিচের কোঁচকানো চামড়া, শিথিল গাল নজর এড়ায় না। এ রকম মানুষ খুব বেশি না হলেও আছেন – এক একটি বর্ণচোরা আম।

অকাল বার্ধক্যই বা কম কি ? বিশেষ করে আজকের দিনে। জীবনভারে নিষ্পেষিত, হারানো স্বাস্থ্য, ক্রমবর্দ্ধমান দুশ্চিন্তা চল্লিশেই বুড়িয়ে দিচ্ছে অনেক মানুষকে। চুল পেকে দাঁত নড়ে কুঁজো হয়ে অকাল বার্ধক্যের শিকার হচ্ছে তাঁরা।

একালে পাকা চুল একটা ফ্যাসান। ছেলেদের কথা বাদ দিলাম, এমন কি পঁচিশ ত্রিশ বছরের মেয়েরা শ্যাম্পু করে করে চুলকে খর করে ফেলছে – রোদের আলোয় রূপালি রেখা তাদের মাথায় ঝিলিক মারে। মেয়েদের মাথার চুল অকালে পক্ক হলেও তারা বেশ কায়দা-কানুন করে বয়স ধরে রাখছে – এ ব্যাপারে কনসালটেন্সি আর এজেন্সির ভূমিকা নিচ্ছে পাড়ার হালফ্যাসানের বিউটি পার্লারগুলো – পাশাপাশি উপদেশ দেবার মত মেয়েলি পত্র-পত্রিকা তো আছেই।

বুড়িয়ে যাওয়া না যাওয়ার পিছনে মনের ভূমিকা কে অস্বীকার করবে ? তুড়ি মেরে, গান গেয়ে, হো হো করে হেসে, সমস্যাকে গায়ে না মেখে চলতে পারার সেই মানুষগুলি গেল কোথায় ? তারা যে কালে ছিল তখন ছিল না এখনকার মতো উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা। তাই বয়স হবার আগেই তাদের অনেকে হারিয়ে যেত। আজ মানুষ বাঁচছে অনেক দিন – ওষুধপত্রের জন্য। তবে প্রাণের টানে বেঁচে থাকার রেওয়াজটা যেন চলে গেছে। উচ্চকিত হাসির আওয়াজে চমকে ফিরে তাকানোর ঘটনা এখন নেহাতই দুর্ঘটনা, কোন কোন বিচারে এমন দমকা হাসি শোভনতার সীমা ছাড়ানো খাপছাড়া খোঁচা !

এসব কথা থাক্। তার চেয়ে বরং যারা সত্যি সত্যি বুড়ো হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বুড়ো মানুষদের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এদিক-ওদিক ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে ব্যতিক্রমের থেকে সাদৃশ্য বেশি।

ঘুম কমে যাওয়া – এ রকম একটা বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে মানুষকে সাত-আট ঘন্টা ঘুমোতে হয়, বৃদ্ধ বয়সে তা অনায়াসে নেমে যায় চার-পাঁচ ঘন্টায়। তাও সে ঘুম ছেঁড়া ছেঁড়া – স্বপনে জাগরণে কেটে যায় রাত। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন বাড়ির বুড়োকর্তা। ঘট্ ঘট্ খট্ খট্ শব্দ আর তার সঙ্গে ছেলে নাতিদের প্রতি শয্যাত্যাগের আহবান – ফলত বিরক্তির উৎপাদন আর অসন্তোষ !

এ থেকে যদি কেউ ভাবেন, দিনের চব্বিশ ঘন্টার কুড়ি ঘন্টায় প্রবীণেরা কর্মক্ষম তাহলে তিনি ভুল করবেন। দিনে-মানে ইজিচেয়ারে বসে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়া, দুপুরে নিদ্রা না হোক ঝিমুনি, সময়ে অসময়ে অবসাদ বুড়ো মানুষদের লেগেই থাকে।

এছাড়া ভুলে যাওয়া – বিশেষ করে নাম পরিচয় ভোলা তাদের বেলায় বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বভাবও খানিকটা বদলে যায়। যিনি কর্মজীবনে বেশ গম্ভীর ও স্বল্পবাক তাঁকে দেখা যায়, অবসর অন্তে পরিজনের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলছেন, সংসারের খুঁটি-নাটি ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন, মাসে ক'কিলো তেল খরচ হচ্ছে তার হিসাব নিচ্ছেন। ফল কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতেই পারছেন। গিন্নি পুত্রবধূরা প্রথম প্রথম কৌতূক করে, তারপর বাক্য বিনিময়, বুড়োর ভীমরতি নিয়ে আড়ালে আবডালে আলোচনা। পুত্ররা বিব্রত হয়, গিন্নী মুখঝামটা দিয়ে

কর্তাকে ভেতর বাড়ি থেকে বের করে দেন।

এত যে কথা বললাম তা সর্বত্র যে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে তা নয়। যেমন বুড়িয়ে যাওয়াকে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় না তেমনি বার্ধক্যের আচার আচরণ অতটা বিশ্বজনীনও নয়। বুড়ো মানুষদের কেউ কেউ বাকপটু, কেউ পারতপক্ষে কথা কন না। কেউ বয়স বাড়িয়ে বলেন, কেউ বয়স কম দেখিয়ে প্রৌঢ়দের দলে ভেড়েন। কেউ পড়েন ধর্মের বই, কেউ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ। গল্প উপন্যাস কবিতার দিকে ঝোঁক আছে এ রকম প্রবীণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। আড্ডা চালানোর থেকে একমুখী বক্তৃতা করার দিকে ঝোঁক বেশি দেখা যায়।

আসলে বুড়ো মানুষদের ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করলে কখনও কখনও ভারসাম্যহীনতার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট জীবনের চাওয়া-পাওয়ার গরমিল হামেশা এর কারণ হয়। সাংসারিক জীবনে অশান্তি, অর্থাভাব, নিরাপত্তাহীনতা, পরিজনের দিক থেকে বিমুখতা সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে মানসিক জটীলতা কম হলেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সংসারের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বিতাড়ন, পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে টানাপোড়েন নতুন কিছু জটীলতা তৈরি করে। বার্ধক্যের সমস্যাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক দিকগুলি যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ।

একেবারে বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ প্রৌঢ় বয়সে মানুষের মধ্যে বার্ধক্যের ভাবনা-চিন্তা বেশি পেয়ে বসে। কতদিন বাঁচবো, প্রিয়জনেরা মৃত্যুর সময় কাছে থাকবে কিনা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে আগে যাবে, ছেলেমেয়েরা শেষ জীবনে দেখবে কিনা, শরীর কেমন থাকবে, অর্থকষ্ট থাকবে কিনা—ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন পঞ্চাশ বছরের কোটায় মানুষকে ছেঁকে ধরে।

এজন্য কেউ ছোটেন জ্যোতিষীর কাছে। হাত মেলে ধরে প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। কেউ ধরেন গুরু, বাবা। বিহবল নয়নে গুরুজীর উপদেশ-আদেশ শোনেন। কেউ সংসার নিয়ে সাংঘাতিকভাবে মেতে ওঠেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, ছেলেদের ভালো চাকরী, মেয়েদের ভালো বিয়ে, গিন্নীর মন মতো একখানা বাড়ি, আত্মপ্রসাদ লাভে সক্ষম ব্যাংক ব্যালেন্স বা কোম্পানী ডিপজিট তাঁদের সংসার রসে একেবারে মজিয়ে

রাখে আর তাঁরা ভাবেন – সংসারের প্রতি আমি যখন প্রাণপণ খেটে কর্তব্য করলাম তখন বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্তে শান্তিতে দিনগুলি কাটবে আমার। পুত্রবধূ, পুত্র, পৌত্ররা সেবা-যত্নে ভরিয়ে রাখবে আমাকে।

আর একদল মানুষ আছেন। সারা জীবন অফিস-অফিস করে গেলেন। চাকরীতে উন্নতি, আরো উন্নতি। অফিস পলিটিক্সের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁরা ঢুকে যান। তারপর একদিন যখন অবসর নেন, অথৈ জলে পড়ে যান তাঁরা। কোথাও আর মানিয়ে চলতে পারেন না, কি বাড়িতে কি বাইরে। বাড়িতে সংসারে মন দিতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ হাজার অসুবিধা তৈরি করেন, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখেন যে মানসিকতার ওয়েভ লেংথ-এ বিস্তর পার্থক্য ঘটে গেছে, দু-চার দিন লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখেন মন বসাতে পারছেন না—পড়াশুনা তো একটা অভ্যাসের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যায় বুড়োদের আসরে ভিড়ে যান, কিন্তু সেখানেও তিনি ব্রাত্য, মন পড়ে থাকে অন্যত্র। ক্রমে হতাশা অভিমান চেপে ধরে। বড় স্পর্শকাতর হয়ে যান। পরিজনের সাধারণ কথাকেও বাঁকা ভাবে ধরেন। ভাবেন – আর কেন, সংসারে আমি উদ্বৃত্ত, আমার কোন প্রয়োজন নেই, এবার গেলেই হয়।

কিন্তু জীবনের প্রতি ভালবাসা আগ্রহ কি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়? বার্ধক্যে শরীর ভাঙ্গলেও মন সতেজ থাকে, নিউরণের কর্মক্ষমতা আশি বছর পার হয়েও বজায় থাকে। ক্রিয়ার ক্ষমতা নেই অথচ প্রতিক্রিয়া আছে। আঘাত ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ আঘাত পাবার অবস্থায় মন আছে – এ এক দুঃসহনীয় অবস্থা। মানুষ তখন স্বস্তি নয়, শান্তি খোঁজে। সুখকর পরিতৃপ্তির পরিবর্তে সান্ত্বনা পেতে চায়। ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের কাছে যে আশ্রয় শান্তি নিরাপত্তা আনন্দ পেয়েছিল তার জন্য নতুনভাবে উন্মুখ হয়ে ওঠে? কিন্তু কে দেবে শান্তি?

ডাক্তার ডাক্তার বাতিকটাও বুড়ো বয়সের কম-বড় সঙ্গী নয়। অসুখ—বিসুখ এমনিতে বুড়ো মানুষদের লেগে থাকে, তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শরীর-ভাবনা দেখা দেয় অনেক সময়। অবশ্য এমন প্রবীণও আছেন যিনি সংসার-সমাজ সর্ম্পকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শরীরকে অবহেলা করেন। আমার এক মাষ্টারমশায় শেষ জীবনে এরকম হয়েছিলেন। এমনিতে যথেষ্ট রাশভারী ছিলেন, মুখের উপর চট্ করে কেউ কথা বলতে

পারতো না। অবসরের পর মোটামুটি চলছিল। সত্তর বছরের পর নানা খুঁটিনাটি নিয়ে মান অভিমান জমতে লাগলো তাঁর মনে। হয়তো একদিন শারীরিক অসাচ্ছন্দ্যের কথা পরিজনকে বলেছিলেন, পরিজনেরা তা নিয়ে তেমন উদ্বেগ দেখায়নি। ব্যস, সেই থেকে শুরু হলো। অভিমানের মেঘ জমতে জমতে কখন যে বর্ষণ-উন্মুখ হয়ে উঠেছে তা জানতে পারে নি কেউ। হঠাৎ একদিন স্ট্রোক। তখনও সজ্ঞান অবস্থা। ডাক্তার ডাকতে কিছুতেই রাজি হলেন না — প্রায় একরকম আত্মহত্যাই করলেন।

তবে বলতেই হবে, আমার মাষ্টারমশাইয়ের ঘটনা খুবই ব্যতিক্রমী প্রকৃতির। বেশির ভাগ প্রবীণের মধ্যে ওষুধ-ডাক্তারের দিকে ঝোঁকটা প্রবল। বিশেষ করে যখন তখন রক্তচাপ মাপা, কিংবা বুকে একটা ব্যথা হলেই ই-সি-জি করা, কারণে অকারণে টনিক-মালটিভিটামিন খাওয়া আর ফুস্কুরিকে ক্যান্সার ভেবে আতঙ্কিত হওয়া প্রায় নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার।

বুড়োরা তো বটেই, চল্লিশোর্ধ মানুষের মধ্যে ডাক্তার-ওষুধ প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান। স্বাস্থ্য সর্ম্পকে ভাবনাচিন্তাগুলি খুব সুকৌশলে ওষুধকোম্পানী এবং মেডিকোইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের শিল্পগুলি জনসাধারণের মধ্যে তৈরি করে। আমাদের সমাজের স্বাস্থ্য-সংস্কৃতির অনেকটাই বানানো — বিজ্ঞাপন, আলোচনা, প্রচার, নার্সিংহোম-মাহাত্ম্যের ঢক্কানিনাদ প্রভৃতি একই অভিমুখে পরিচালিত। মানুষ যাতে বেশি বেশি চিকিৎসাকেন্দ্রিক জীবনের অংশীদার হয় তার জন্য এত ব্যবস্থা। সুস্থভাবে বাঁচার মূল চাবিকাঠি কোথায় তা কখনই ওষুধ শিল্পের কায়েমী স্বার্থরা প্রচারে আসতে দেয় না।

এই যখন অবস্থা তখন রোগভোগের নিত্যে শিকার যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের ডাক্তার-ওষুধ নির্ভর হয়ে পড়াকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

প্রবীণদের মধ্যে আমরা প্রজ্ঞা আশা করি, আশা করি স্থিতধী স্নেহময় ব্যক্তিত্বকে। আমাদের আশা পূর্ণ করতে হলে তাঁদের প্রতিও নবীনদের কিছু কর্তব্য থাকে। শুধু পরিবারে বাস করতে দেওয়া আর দুমুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট নয়। অবশ্য সেটুকুও অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভাগ্যে জুটছে না। পরিজন-পরিত্যক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা বাড়ছে। বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা অপ্রতুল, তাছাড়া তা মেনে নিতে অনেকেই পারেন না। অত যে

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির দেশ ইংল্যান্ড আমেরিকা – সেখানেও কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ওল্ড হোমকে মেনে নিতে পেরেছেন ?

একদিকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষ থেকে পরিজনকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা, অন্যদিকে পরিজন—বিশেষ করে পুত্র-পুত্রবধূদের সে বিষয়ে অনীহা, অবস্থাকে ঘোরালো করে তোলে। মানসিক চাপ সইবার ক্ষমতা তো সবার সমান নয়। তাছাড়া বুড়ো-বুড়িরা সেকালের মানুষ। পুত্রদের সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যাশা ছিল ভিন্নরকমের।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে এ সব কারণে মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে, বাড়ছে মানসিক ব্যাধি। দুঃখমাখা মুখ নিয়ে সারি সারি পিতামহ পিতামহীরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর শান্তির আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে তাঁরা কিভাবে দিনাতিপাত করেন, আমরা কি তা ভেবে দেখেছি ?

স্নেহ নিম্নগামী। বয়স্করাই নবীন প্রজন্মকে স্নেহ করে – সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বার্ধক্য তো দ্বিতীয় শৈশব। সেই শৈশবে তাদের প্রয়োজন হয় স্নেহের, ভালোবাসার। ভালোবাসার কোমল করতলের প্রার্থী তারা। স্নেহ না পারি, ভালোবাসা না পারি, মানবতামাখা করুণাও তো আমরা তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে পারি !

প্রবীণদের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকটা সব সময় গুরুত্ব পায়। যে শরীর একসময় রোদে পুড়ে জলে ভিজে একরত্তি টস্‌কায়নি, বৃদ্ধ বয়সে সে শরীর সামান্য জোলো হাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোদের দাপটকে অসহ্য মনে হয়। অনেক কিছুকেই বৃদ্ধ শরীর মেনে নিতে বা আত্মস্থ করতে পারে না।

ধরা যাক খানা-পিনার কথা। কম বয়সে দেদার লুচি মাংস মিষ্টিকে পেটে পুরে দিব্যি থাকা যায়। খিদে যেন মানুষকে তাড়া করে বেড়ায়। অনিয়ম করে বেহিসাবে অনেকটা খেয়ে নিয়েও অস্বস্তির শরিক হতে হয় না। যখন খুশি খাওয়া হলো, যতটা ইচ্ছে খাওয়া হলো – কোনকিছুতেই শরীর পেছপা হয় না। তুড়ি বাজিয়ে তরুণ-তরুণীরাই বলতে পারে – শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।

কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ জীবন কি অতই সহজ ? এমনিতেই অম্বল অজীর্ণ বুকজ্বালা পেটফাঁপা নিত্য লেগে আছে, তার উপর যদি

বেনিয়মে বেশি খাওয়া – দাওয়া হয় তো কথাই নেই। নিত্যদিনের অসুখ তো বাড়বেই, তারপর তেমন তেমন হলে হৃদ্‌যন্ত্রকে টান মারবে, রক্তচাপকে ঠেলে তুলবে। তাই বুড়ো বয়সের খাওয়া হওয়া চাই সহজ সরল। সহজপাচ্য, পরিমাণে কম খাদ্য সময়মতো গ্রহণ করতে হবে।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের প্রসঙ্গ আসে। আগেই জানিয়েছি বৃদ্ধের ঘুম ক্ষণস্থায়ী, অস্থির প্রকৃতির। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে সকাল সকাল বিছানার আশ্রয় নেওয়া ভালো। নাহলে, আর কিছু না হোক, খাদ্য নিজেই হাজার বিপত্তি ঘটিয়ে তুলবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক রসায়ন বদলে যায়। রক্তচাপ বাড়তির দিকে চলে যায়, হৃদ্‌যন্ত্র অনিয়মিতভাবে কাজ করে, রক্তে কোলেস্টরল বাড়ে, বাত ব্যাধির বিস্তার ঘটে, দেহের সাবলীল ছন্দ কোথায় হারিয়ে যায়, কারণে অকারণে এখানে ওখানে ব্যথা আড়ষ্টতা দেখা দেয়, সর্দি কাশি হাঁচি হাঁপানী দেহের প্রায় অনুষঙ্গী হয়ে যায়। চলা ফেরার মধ্যে মন্থরতা আসে। প্রবীণেরা ধীরে বসেন, ধীরে হাঁটেন, মৃদু উচ্চারণে কথা বলেন। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি ছোট মাপের হয়ে যায়। হাত পা নাড়ার অভ্যাস কমে, হো হো করে হাসতে ভুলে যান বৃদ্ধরা, দৌড়ানো তো তাঁরা ভাবতেই পারেন না। সিঁড়ি ভাঙ্গার কথা শুনলে আঁতকে ওঠেন।

নিত্য দিনের অভ্যাসই বা কম কি পাল্টায়? বেশিক্ষণ ধরে স্নান করলে বয়স্কদের ঠান্ডা লাগে, ঠান্ডা মেঝেতে শুলে সর্দি বা খালি গায়ে বসে থাকলে জ্বর জ্বর বোধ হয়। রোদে হাঁটলে মাথা ধরে, প্রত্যাশিত ঘুম না হলে গা ম্যাজ ম্যাজ করে। মল পরিষ্কার না হলে তো কথাই নেই। কোমরে ব্যথা, পেট ভার, ক্ষুধামান্দ্য এমন নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

বৃদ্ধদের আর একটা সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ডের প্রসারণজনিত সমস্যা। ওষুধে না প্রশমিত হলে অস্ত্রোপচারের দিকে যেতে হয়। মূত্র সংক্রান্ত ব্যাধিরও বিকাশ হয় এই বয়সে। নিত্য দিন যদি প্রচুর জল পান করা যায় তাহলে হজমের ব্যবস্থা যেমন সক্রিয় থাকে তেমনি মূত্র সংক্রান্ত ব্যাধির হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বহুমূত্র ব্যাধি হামেশাই প্রৌঢ় বয়স থেকে শুরু হয়। রক্তের শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা শরীর করে রাখে। প্যানক্রিয়াস

গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন রস বেরিয়ে এসে রক্তের শর্করার মাত্রাকে সঠিক মানে বেঁধে রাখে। প্যানক্রিয়াস অকেজো হলে বহুমূত্র হয়। বহুমূত্র ব্যাধি নানা জটীলতাকে ডেকে আনে। ওজন হ্রাস, কর্মক্ষমতার অবদমন, ক্ষত নিরাময়ে বাধা, চোখের রোগ প্রভৃতি নানান জটিলতা বহুমূত্র ব্যাধি আমাদের শরীরে ডেকে আনে।

চোখে ছানি পড়া, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়া, শ্রবণ শক্তির হ্রাস – এগুলিও বৃদ্ধ বয়সের স্বাভাবিক ব্যাধি।

হাড়ের নমনীয়তা কমে যায় বার্ধক্যে। হাড় ভাঙ্গলে চট্ করে তা আর জোড়ে না। কোথাও আছাড় খেলে বা পড়ে গিয়ে চোট্ পেলে ভালোভাবেই ভুগতে হয় বৃদ্ধদের।

নানারকম স্নায়ু সংক্রান্ত ব্যাধির এই সময় বিকাশ হয়। নিউরোমাসকুলার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে, কোন কিছুকে ধরতে গেলে হাত কাঁপে, চলতে গেলে পা টলমল করে – এ সব সত্তর আশি বছরের মানুষের মধ্যে খুবই দেখা যায়। স্নায়ু সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাধিও দেখা দেয়। মানুষকে ভুলে যাওয়া, সাধারণ স্মৃতি লুপ্ত হওয়া, মেজাজ খিট্খিটে হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, কাজ করার ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলা, যখন তখন ঘুমিয়ে পড়া প্রভৃতি বৃদ্ধ বয়সে খুব দেখা যায়।

বুড়ো মানুষদের দৈনন্দিন জীবন দ্রুত বদলে যায়। স্বাভাবিক কারণে তার জগত ছোট হয়ে যায়। নিজস্ব বাসস্থান ও তার চারপাশের ক্ষুদ্র পরিসরই ক্রমে তার পৃথিবী হয়ে ওঠে। এই পৃথিবীতে তাকে বাঁচতে হলে চাহিদাকে কমাতে হয়। এমনিতে বুড়ো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য উপাদানের প্রয়োজন হয়, তবু তাকে নিয়ে কত সমস্যা। সীমিত ক্যালোরির খাদ্য, সামান্য ফল দুধ, একটু হাঁটা–চলা, মোটামুটি ঘুম – এই তো তার জীবনের চাহিদা। কিন্তু মনের চাহিদার জন্য সমস্যা পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনের অনুপান সীমাবদ্ধ আকারের হলেও তাদের মানসিক ও মানবিক চাহিদা সীমাহীন। এই পারস্পরিক বৈপরীত্যই বার্ধ্যকের যাবতীয় সমস্যার মূলে।

কে না চায় সুন্দর দীর্ঘ জীবন ? কিন্তু বার্ধক্যের অমোঘ

নিয়মের বাইরে কে যেতে পারে ? তবে হ্যাঁ, আগের তুলনায় আজকাল আমরা বেশিদিন বাঁচি। আমাদের দেশে গড়পড়তা আয়ু পঞ্চাশ বছর। স্বাধীনতার আগে আমাদের গড় আয়ু অনেক কম ছিল। গত শতাব্দীতে *প্লেগ* কলেরা বসন্ত — এক একটা মহামারীতে লাখ লাখ লোক উচ্ছেদ হয়ে যেত। তেমন তো আর এখন হয় না। ভারতে গড় আয়ু কিছুটা কম, পৃথিবী জুড়ে মানুষের আজকের দিনে গড় আয়ু প্রায় ৬০ বছর। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে তো গড় আয়ু ৭০ থেকে ৭৫ বছর। হিসেব কষে দেখা গেছে যে গত দেড়শ বছরে মানুষের আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

তবে এত করেও একশ বছরের উপরের মানুষ খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। আমাদের দেশে শতায়ু ব্যক্তির সংখ্যা হাতে গোণা যায়, শতকরা হিসাবে খুবই নগণ্য। এমনকি স্বাস্থ্যন্নোত পশ্চিমী দেশেও শতায়ুদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। যে সব দেশে দীর্ঘজীবন লাভকারী মানুষরা সংখ্যাধিক্য পরিমাণে বাস করেন তাদের মধ্যে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্যতম। বিশেষজ্ঞদের মতে, সে দেশেই ২০,০০০ শতায়ু ব্যক্তি আছেন, এদের মধ্যে আবার মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। হিসাব বলে যে প্রতি দশ লক্ষ সোভিয়েটবাসীদের মধ্যে ৮০ জন ১০০ বছরের উপরে আয়ু। অন্য দেশে এটা যথেষ্ট কম। যেমন — প্রতি দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ জন, ফ্রান্সে ৭ জন, ব্রিটেনে ৬ জন, জাপানে ১ জন শতায়ু ব্যক্তি বাস করেন।

শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পিছনে পারিবারিক ধারা, পরিবেশ, মানসিকতা, জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদি কাজ করে। কিন্তু কোন দেশের গড় আয়ু নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, জনস্বাস্থ্যের প্রকৃতির উপর। গড় আয়ু কোন্ দেশে কত তার একটা হিসাব হলো—

সুইডেন — ৭৫ বছর, জাপান — ৭৫ বছর, ব্রিটেন — ৭২ বছর, চীন — ৬৪ বছর, ভারত — ৫০ বছর, বাংলাদেশ — ৪৬ বছর।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। সামান্য কিছু শতাধিক ব্যক্তিদের কথা বাদ দিলে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি মানুষের যে গড় আয়ু দিচ্ছে তা প্রাচীনকালের বয়স্ক মানুষের আয়ুকে ছাড়িয়ে যায়নি। বিজ্ঞানের এতটা সাফল্য সত্ত্বেও সেই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের যুগের মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু এই বিশ শতকের শেষে এসেও তেমন বদলায়নি। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস

বেঁচেছিলেন নব্বই বছর, আটানব্বই বছর বেঁচেছিলেন সুবক্তা ইসোক্রেটাস। এরই কাছাকাছি বয়সে পৌছেছেন আধুনিক যুগের কিছু বিখ্যাত মানুষেরা। বার্নাড শ চুরানব্বই বছর, বার্ট্রান্ড রাসেল তিরানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। চিরদিনই দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের সংখ্যা কম। তবে আধুনিক বিজ্ঞান সংক্রামক ব্যাধি, প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তাকে কমিয়ে দেওয়ায় আজ অনেক বেশি মানুষ বার্ধক্যের স্বাদ পাচ্ছে। বিজ্ঞানের যুগে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারি – বিজ্ঞানীরা এমন কিছু করুন যাতে বার্ধক্যকে আমরা আরো কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি, আরো কিছুদিন সুস্থ সবল ভাবে পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়াতে পারি।

বিজ্ঞানীরা আর কিছু করতে না পারুন, অন্তত অকাল বার্ধক্যকে রোধ করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পেরেছেন। আর তা পেরেছেন দীর্ঘজীবী মানুষদের জীবনযাত্রাকে লক্ষ্য করে। পৃথিবীর অন্তত তিনটি স্থান দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদের আবাসভূমি বলে পরিচিত। এগুলি হল – দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর অঞ্চল, পাকিস্তানের দখলে কাশ্মীরের হুনজা এবং তখনকার সোভিয়েট ইউনিয়নের ককেশাস পর্বতদেশ।

এখানকার মানুষেরা কেবল যে খোলামেলা আবহাওয়ায় বাস করে তাই নয়, তাদের জীবনযাত্রা সহজ সরল, খাদ্য টাটকা ফল, শব্জী এবং কম পরিমাণে আমিষ। আনন্দময় কর্ম্মমুখর এদের জীবনে যেন বাঁচাটাই একটা আনন্দের ব্যাপার। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের একজন হলেন মেজিদ আগায়েভ, বয়স ১৪৩ বছর। ইনি আজারবাইজানের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করেন। সারাজীবনই কিছু না কিছু কাজ করেছেন, রোজ প্রায় দশ কিলোমিটারের মত পার্বত্য পথ হাঁটেন। ওঁর মতে, সেরা ওষুধ হলো টাটকা বাতাস, ঝরণার জল আর রোদ।

ককেসাশের মানুষদের এতটা দীর্ঘায়ু হবার কারণ কি তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা জানতে চাইছেন। পরিবেশ অবশ্য একটা কারণ। দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের বাসস্থান সমুদ্রতল থেকে অনেক উপরে, পাহাড়ের প্রায় দেড় হাজার মিটার উঁচুতে। পাহাড়ীদের শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হতে হয়, পরিবেশের সরল প্রাকৃতিক জীবন স্বাভাবিকভাবে তাদের স্নায়ুর উপর কোন চাপ তৈরি করে না, বরং স্নিগ্ধতার আবেশ আনায়। দীর্ঘজীবন লাভের পিছনে বংশগত কারণগুলি কাজ করে। দেখা গেছে যে দীর্ঘায়ু পিতামাতার সন্তান প্রায়ই দীর্ঘায়ু হয়। ককেসাশের

কোন কোন গ্রামে নব্বই বছরের কেউ মারা গেলে সবাই অবাক হয়, বলে – বড্ড তাড়াতাড়ি ও চলে গেল।

আশি থেকে নব্বই বছর – এটাই তাহলে মানুষের আয়ুর উর্দ্ধসীমা। দুর্ঘটনা, কোন বিশেষ শারীরিক ত্রুটি বা ব্যাধির আক্রমণ না ঘটলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রাচীন কালে যত বছর বাঁচতে পারতো, এখনও তত বছর পারছে। এখান থেকে যদি কেউ অনুমান করেন যে প্রজাতি হিসাবে মানুষের বয়স সুনির্দিষ্ট করা আছে অথবা মানুষের ক্রোমসোমস্থ জিন বা বংশাণুতে বয়স সংক্রান্ত প্রোগ্রামিং করা আছে তবে তিনি বড় একটা ভুল করবেন না।

একথা বলার আর একটি কারণ আছে। অন্যান্য প্রাণীদের আয়ুর সীমা প্রায় নির্দিষ্ট করা আছে। একটা ইঁদুরকে যতই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রাখা হোক না কেন, ইঁদুর কখনও মানুষের আয়ু পাবে না, যেমন মানুষ কখনও হাতির পরমায়ু পাবে না।

ড্রসোফিলা মাছি নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। জেনেটিক্সের গবেষণায় এই মাছি খুব উপযুক্ত, কারণ ড্রসোফিলা মাছি বাঁচে কম-বেশী চল্লিশ দিন মাত্র। ক্ষুদ্র পরমায়ুর জন্য বিজ্ঞানীদের পক্ষে এদের অনেক বংশধরদের পরীক্ষা করা সোজা। সাধারণ মশাও মাস দুই-এর বেশি বাঁচে না। এতো গেল পতঙ্গদের কথা।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ইঁদুর বাঁচে তিন বছর, বেড়াল দশ বছর, ঘোড়া বাঁচে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর। অস্তন্যপায়ীদের মধ্যে, যেমন সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী গালাপাগোস দ্বীপের কচ্ছপকে প্রায় ১৮০ বছর বাঁচতে দেখা গেছে।

আর একটা জিনিস বিজ্ঞানীদের নজর এড়ায়নি। স্তন্যপায়ীদের আয়ুষ্কালের সঙ্গে তাদের সাবালকত্ব লাভের বয়সের একটা সম্পর্ক আছে। বেড়াল সাবালক হয় দেড় বছরে, ঘোড়া সাবালক হয় চার বছরে, মানুষ সাবালক হয় বিশ বছরে। বেড়াল বা ঘোড়ার সাবালকত্ব অর্জনের বয়সের প্রায় সাতগুণ বেশি হলো তার আয়ু। এই বিচারে মানুষের আয়ু ১২৫ থেকে ১৫০ বছর হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। যদিও মানুষ উন্নত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী এর মধ্যে সামাজিক টানাপোড়েন ও অসামঞ্জস্যের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন।

এই শতকের ত্রিশের দশকে আমেরিকার মেট্রোপলিটান লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানী হিসেব করে দেখেছে যে ষাট বছরের আমেরিকান আরো বছর পনেরো খুব বেশি হলে বাঁচে। এর অনেক দিন পর, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ষাটের দশকে ঐ কোম্পানীর হিসাব এই যে ষাট বছরের এক আমেরিকানের পক্ষে আরো সতের বছর বাঁচা সম্ভব। দু হাজার সাল নাগাদ অর্ধেক আমেরিকানের বয়স হবে পঞ্চাশের উপর। ভাবা যায়, কি বুড়োটে জাত হবে ওরা ?

এর থেকে এটা বোঝা যায়, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও আয়ুর উর্দ্ধসীমাকে উন্নত করা যায়নি। সুতরাং বংশাণু সংক্রান্ত মতটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আজকের বিশ্বে বুড়ো মানুষদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। অবসর নেবার পর নতুনভাবে কাজ শুরু করেছে এমন লোকের সংখ্যা বাড়ছে। কাজের প্রশ্নে বয়স্কা মহিলাদের কোনদিনই সমস্যা ছিল না। ঘর-গেরস্থালীর কাজ তো কোন দিন শেষ হয় না। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ১৯০০ সালের তুলনায় পৃথিবীতে ৬৫ বছরের উর্ধের জনসংখ্যা অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে এই হার বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

মানুষের সমাজে বৃদ্ধ মানুষদের সমস্যা নিয়ে ভাবনাও বেড়েছে। বিজ্ঞানীদের কাজও বেড়েছে। বার্ধক্য কি ও কেন, বার্ধক্য রোধ করার কোন উপায় আছে কি না, বার্ধক্য কি একটি ব্যাধি — ইত্যাদি প্রশ্নে বিজ্ঞানীমহল আলোড়িত। গড়ে উঠেছে নতুন বিজ্ঞান—বার্ধক্যবিজ্ঞান (gerentology)। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে বহুদূর পর্যন্ত গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, লেখা হয়েছে চল্লিশ—পঞ্চাশ হাজার বই। নানা মুনির নানা মতের মতো দু-আড়াইশ তত্ত্ব হাজির হয়েছে। তত্ত্বগুলি থেকে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। ক্রমে আমরা সিদ্ধান্তগুলি জানতে পারবো।

বয়সের সঙ্গে দৈহিক কর্মক্ষমতার সম্পর্ক আছে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর দৈহিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ হয়। যৌবন শেষ হয়ে অর্থাৎ চল্লিশ বছরের পর থেকে প্রৌঢ়ত্ব শুরু হয় এবং প্রৌঢ়ত্বের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

মনন, প্রতিভা, কল্পনা, সৃজনীশক্তি – এদের সঙ্গে কি বয়সের কোন সম্পর্ক আছে ? পৃথিবীর মনীষী, চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবানদের জীবন পর্যালোচনা করলে কি কোন সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় ?

দেখা গেছে, সৃজনশীলতা বা প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ হয় যৌবনের প্রথম পর্বে। বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে বড় বড় বিজ্ঞানী, চিত্রকর, কবি, সুরস্রষ্টারা তাদের অমর কীর্তির রূপ দিয়েছেন । আইনস্টাইনের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলি তাঁর তরুণ বয়সেই হয়েছিল। গ্যালিলিও, নিউটন বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, তখন তাঁরা বয়সে নবীন। কিটস, শেলী বেশিদিন বাঁচেননি। চিত্রশিল্পী ভ্যান গগ, সুরস্রষ্টা মোৎসার্ট, বিটোফেন একই পথের পথিক।

তাহলে কি বলতে হয় যে যৌবনে শরীর ও মস্তিষ্কের যখন পূর্ণ বিকাশ হয় তখন প্রতিভার স্ফূরণ হয় ? প্রতিভার সঙ্গে মস্তিষ্কের নিশ্চয় একটা সম্পর্ক আছে, সম্পর্কের প্রকৃতি বস্তুগত। এমনও হতে পারে, দেহের পূর্ণতা অর্জন করার সময় দেহ সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম থাকে এবং কর্মক্ষমতার প্রতিভার নামক দিকটা সর্বাধিক বিকশিত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রতিভার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারেননি, সেজন্য নিশ্চিত উত্তরগুলি এখনই দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিভার স্ফূরণ তারুণ্যে হওয়ার অর্থ এই নয় যে সমস্ত রকমের সৃজনশীলতা, মনন, প্রজ্ঞাজনিত ভাবনাগুলি পরিণত জীবনে আসে না। বরং এটাই দেখা গেছে, বয়স্ক মানুষেরা সংবেদনশীল হন, তাঁদের মধ্যে সৃজনশীলতা ভালো পরিমাণে সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছরের উর্দ্ধে সংগীত সাহিত্য কাব্য নাটকে যথেষ্ঠ সৃজনশীল ছিলেন, তাঁর কল্পনায় কোথাও ঘাটতি দেখা যায়নি। বার্নাড শ কিংবা সফেক্লিস বৃদ্ধ বয়সে একাধিক ভালো নাটক লিখেছেন। মস্তিষ্কের সক্রিয়তা অনেকদিন বজায় থাকে, কারণ মস্তিষ্কের কোষ নিউরণ দীর্ঘজীবী প্রকৃতির।

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে আশি বছরের পর মস্তিষ্কজনিত ক্ষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন – ভুলে যাওয়া, চিনতে না পারা, অসংলগ্ন কথা-বার্তা বলা, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলা অথবা হাত পা কাঁপা – এসব বার্ধক্যের ছবিগুলি নিউরণ কোষের ক্ষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা দেখেছি, সাধারণভাবে মানুষ আশি-পঁচাশি বছরের

বেশি বাঁচে না। এ থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন, নিউরণের সক্রিয়তার উপর জীবনের সর্বোচ্চ আয়ু নির্ভরশীল তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। কিন্তু এই সম্পর্কগুলি এখনও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়নি, বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে পারেনি।

মস্তিষ্কে দেড় হাজার কোটি সংখ্যক নিউরণ কোষ থাকে। ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে মানুষের মাথার নিউরণ কোষ প্রতিদিনে এক লক্ষ সংখ্যায় মরতে থাকে। অর্থাৎ, এই হারে চলতে থাকলে মোট দশ ভাগের এক ভাগ নিউরণ কোষকে মরতে হলে চল্লিশ বছর লাগে। অর্থাৎ, সত্তর বছর বয়সে মানুষ তার মোট নিউরণ কোষের এক-দশমাংশ হারিয়ে ফেলে। হতে পারে, এক-দশমাংশ নিউরণ কোষের বিলুপ্তি হলে তথাকথিত "বাহাত্তুরে" ব্যাধি বৃদ্ধদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এক-দশমাংশের বেশি নিউরণ কোষ মারা গেলে শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ও শারীরবৃত্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না– দেহ ক্রমশ বিকল হতে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু। আরো লক্ষ্যণীয়, ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানুষ মস্তিষ্কে সর্বোচ্চসংখ্যক নিউরণ কোষ ধারণ করতে পারে। প্রতিভা, সৃষ্টিশীল ক্রিয়া মূলত নিউরণের সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। অতএব, ত্রিশ বছরের আশেপাশে দাঁড়িয়ে প্রতিভাবানরা কেন তাদের মহত্তম সৃষ্টি করে গেছেন – তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

শুধু মস্তিষ্ক নয়, ত্রিশ বছরের পর থেকে শরীরের অন্য অংশের যন্ত্রপাতি দুর্বল হতে থাকে। ত্রিশ বছরের পর প্রতি বছর শারীরিক কর্মক্ষমতা শতকরা ০.৮ ভাগ হারে কমে। ত্রিশ বছরের ফুসফুস ও কিডনির কর্মক্ষমতার যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৬৫ শতাংশ কর্মক্ষমতা ষাট বছরে এসে দাঁড়ায়। হৃদ্‌পিন্ডের কর্মক্ষমতা কমে দাঁড়ায় ৮০ শতাংশে। তুলনামূলকভাবে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা অল্পই হ্রাস পায়। যেমন, মানুষের বয়স যখন প্রায় বিশ বছর, তখন তার মস্তিষ্ক সর্বাপেক্ষা গুরুভার হয়। এর পর থেকে মস্তিষ্কের ওজন ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং শত বৎসরের কাছাকাছি এসে সর্বোচ্চ ওজনের প্রায় দশ শতাংশ কমে যায়। এই হিসাব পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে ফুসফুস বা কিডনির তুলনায় মস্তিষ্কের ক্ষয় বেশ মন্থর।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহযন্ত্রগুলি যেমন দুর্বল হয় তেমনি দেহের গঠন ও স্থিতিস্থাপকতায় দৌর্বল্য দেখা দেয়। পেশীর

কর্মক্ষমতায় বেশ টান পড়ে। মানুষের ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে পেশী সর্বাপেক্ষা দৃঢ় থাকে। এই মানুষই যখন ৬৫ বছরের হয় ততদিনে তার পেশীশক্তির কুড়ি শতাংশ লোপ পেয়ে যায়।

এই যে বুড়ো বয়সে দৌড়-ঝাঁপ করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় তার পিছনেও শারীরবৃত্তীয় কারণ আছে। দৌড়- ঝাঁপের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বিশেষ করে শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে বেশির ভাগ শক্তি আসে। খাদ্যের পরিপাকের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে। বৃদ্ধ বয়সে ফুসফুসের অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশ কমে যায়। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ত্রিশ বছর বয়সে মানুষের অক্সিজেন শোষণ বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতার শতকরা ত্রিশ শতাংশ লোপ পায় ৫০ বছর বয়সে এবং শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ লোপ পায় ৭০ বছর বয়সে।

এতে বোঝা যাচ্ছে ৮০ বছর বা তার উর্দ্ধে বয়স উঠলে কি ব্যাপকভাবে শারীরিক কর্মক্ষমতা কমে।

বার্ধক্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য—ক্রমহ্রাসমান কর্মক্ষমতা। শারীরিক ফিটনেস বা চট্পটে ভাবটাও বেশ কমে যায় বুড়ো বয়সে। আর কে না জানে শরীরকে লঘু ছন্দে চালনা করতে হলে ব্যায়াম বেশ জরুরী।

তাহলে ব্যায়াম করলে কি বার্ধক্য ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়? ব্যায়াম কি বার্ধক্য-প্রতিরোধী একটা কর্মসূচী হতে পারে?

প্রথম কথা, বৃদ্ধ মানুষদের জীবনেও ব্যায়াম প্রয়োজনীয়। আমাদের আলোচনার পরবর্তীস্তরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। সেখানে এই বিষয়টি যথোচিত গুরুত্ব পাবে। তবে ব্যায়াম কতটা বার্ধক্য-প্রতিরোধের ভূমিকা নিতে পারে সে বিষয়ে পূর্ণ গবেষণা হয়নি।

আমাদের দেশে তো বটেই, এমনকি উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতেও ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস নেই। তুলনামূলকভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এককভাবে এবং যুথবদ্ধভাবে শরীর-চর্চার অভ্যাস আছে, যদিও তা সর্বব্যাপক নয়। নিয়মিত

ব্যায়াম বার্ধক্যের প্রশ্নে কি ভূমিকা নেয় তা তেমন জানা নেই—বহু মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগের অভাব এর কারণ।

নিয়মিত ব্যায়াম হজমশক্তিকে বাড়ায়, পেশীগুলিকে আরো কর্মক্ষম করে শারীরবৃত্তকে আরো স্বাভাবিক করে। পঞ্চাশ বছরের পর যখন শরীরে বার্ধক্যের ছায়া পড়তে থাকে তখন ব্যায়ামকে অনেকেই কমিয়ে আনেন। কমিয়ে আনাটা বয়স্ক শরীরের পড়তি সামর্থের কথা মাথায় রেখে করা হয়। যত বয়স বাড়ে তত ব্যায়ামের মাত্রা কমে। আমাদের দেশে বার্ধক্যে ভ্রমণ বা যোগব্যায়ামের রেওয়াজ আছে। গুরুব্যায়াম, পরিশ্রমী খেলাধূলা, সাঁতার, ঘোড়া বা সাইকেলে চাপা প্রভৃতি যুবক, বড়জোর মধ্য বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লঘুব্যায়াম ও বার্ধক্য যেহেতু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমান্তরালভাবে অগ্রসরমান তাই একটি অন্যটিকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করে কি না তা বোঝা যায় না। বরং এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ব্যায়ামের তারতম্য বা উচ্চাবচ পরিবর্তন প্রবীণ শরীরে বড় ধস নামিয়েছে।

বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে না পারুক, নিয়মিত ব্যায়াম যে শরীরের স্বাভাবিক ছন্দকে বজায় রাখে তাতে সন্দেহ নেই। কোমরের ব্যথার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মানুষের যত বয়স বাড়ে কোমরের নিচে বা মাজায় একটা ব্যথা তৈরি হয়। ব্যথাটা এক সময় বাত হয়ে দাঁড়ায়। বসলে ওঠা বা উঠলে বসার মত কাজ বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিবিশেষে এই ব্যথার পরিমাণে তারতম্য হলেও ব্যথা প্রকৃতিতে সর্বজনীন। ব্যথার জন্য মানুষের শরীরের গঠন বা অ্যানাটমি দায়ী। মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে কোমরের নিচের হাড়ে ভার রেখে মানুষকে দাঁড়াতে হয়। শৈশবের এক-দেড় বছর বয়স থেকে যে দাঁড়ানো শুরু তা বিনা বাধায় চলতে থাকে অনেকদিন এবং শেষে একদিন ব্যথাটা মাথা চাড়া দেয়। শিরদাঁড়াযুক্ত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষের বেলায় এহেন ব্যথা হয়। বলা যায়, মানুষের উঠে দাঁড়ানোর শাস্তি!

নিয়মিত ব্যায়ামের মধ্যে থাকলে কোমরের হাড় ও পেশী সাবলীল হয় এবং ব্যথার উৎসকে অনেকটা অবদমিত করে। হাঁটা চলা করলে শরীরের যন্ত্রাংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথেষ্ট

ক্রিয়াশীল থাকে। শরীর হাল্কা বোধ হয়, কাজকর্ম চট্‌পট্‌ করা যায়। এক কথায়, ব্যায়াম বৃদ্ধ বয়সেও শরীরের ফিটনেসকে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শরীরের ফিটনেস এক জিনিস আর বার্ধক্য অন্য জিনিস। স্বাস্থ্য এক জিনিস, বার্ধক্য অন্য জিনিস। শরীর ফিট থাকলেও, স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও শরীরময় বার্ধক্য জাল ফেলতে পারে; তাতে কোন অসুবিধা নেই। একজন অশতীপর বৃদ্ধ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে বার্ধক্যের সুবিধা-অসুবিধাগুলি তাকে সহ্য করতে হবে না—তা নয়। স্বাস্থ্যবান মানুষ সব সময় দীর্ঘজীবী হয় না। দীর্ঘজীবন লাভ যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে ক্রমে আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত হবো।

আমরা বুড়ো হই কেন

এ সংসারে এমন কে আছে যে বুড়ো হতে চায় ? সবাই ভাবে—বয়স বাড়ুক, কালের নিয়মে তা বাড়বেই । কিন্তু আমি যেন সজীব থাকি, আমার স্বাস্থ্য যেন বজায় থাকে, যেন টাক না পড়ে, দাঁত না নড়ে । আমি যেন আজীবন কর্মঠ থাকি এবং কাজ করতে করতে বেশি বয়সে যেন একদিন মারা যাই ।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভের ইচ্ছা—প্রকারান্তরে বুড়ো না হওয়ার ইচ্ছা । বয়স্ক হওয়ার ব্যাপারে মানুষের আপত্তি নেই, যত আপত্তি বুড়োটে হওয়ায় । অসুখ-বিসুখ, পরনির্ভরশীলতা, স্মৃতি লোপ, অশক্ত হাত-পা-দেহ-- এ সবকেই বুড়োটে ব্যাপার বলি । কে-ই বা চায় এ সবের অংশীদার হতে ?

তরুণ বয়সে তো বটেই, এমনকি বার্ধক্যেও মানুষের মন মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে না । অথচ মানুষ যে কোন সময় মারা যেতে পারে ।

মহাভারতে আছে – বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ

"আশ্চর্য কি ?"

যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন ঃ

"মানুষ নিয়ত মারা যাচ্ছে, তবু যারা বেঁচে থাকে তারা ভাবে তারা চিরকাল বাঁচবে ।"

প্রেরণা ও আশা হলো জীবনের চালিকাশক্তি । প্রেরণাহীন ও আশাহীন মানুষ মৃত্যুচিন্তায় বিভোর হয় । মহাভারতে মানুষকে আশ্চর্য জীব বলা হলেও, মানুষকে জীবধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে মৃত্যুকে ভুলে থাকতে হয় ।

শুধু দীর্ঘজীবন নয়, সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে দীর্ঘজীবনই যে কামনার ধন তা বোঝাতে গিয়ে গ্রীক উপকথায় বলা হয়েছে –

দেবী ইয়স দেবরাজ জিউসের কাছে এই মর্মে বর চাইলেন যেন তাঁর প্রেমিক টেথোনাস অমর হয়। জিউস বর দান করলেন। টেথোনাস অমর হলেন ঠিকই, কিন্তু বার্ধক্যে শরীর অচল অসাড় হয়ে গেল। জরাগ্রস্ত টেথোনাস আর নড়তে-চড়তে পারেন না, ঘরেই রইলেন বন্দী হয়ে। এমন অমরত্ব তো বাঞ্ছনীয় নয়।

বার্ধক্যে যৌবনের মহিমা ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন—স্বপ্নই। পুরাণের গল্পে শোনা যায়, রাজা যযাতি তাঁর পঞ্চম পুত্র পুরুর যৌবন নিয়ে বার্ধক্য থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। গল্প গল্পই। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও বার্ধক্যকে নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা বৃদ্ধের শরীরে যৌবনের আরোপ অসম্ভব হয়ে আছে। অসম্ভব এখনও পর্যন্ত। তাই বলে বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দেননি। বার্ধক্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরাবিজ্ঞানে গবেষণা জোর কদমে এগোচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা জরা ব্যাপারটাকে জীবরাসায়নিকের দৃষ্টিতে দেখতে চান। তাঁরা প্রশ্ন করেন—বার্ধক্য কি একটা ব্যাধি? নাকি কোন ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ?

একথা ঠিক, জীবাণুঘটিত ব্যাধি নয় জরা। জরার সবটা ব্যাধির বহিঃপ্রকাশও নয়। বরং ক্রমশ ক্ষীয়মাণ শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী শরীরের ভিতর-বাহিরে যে সব চিহ্নকে ফুটিয়ে তোলে তাই জরা।

আজ পর্যন্ত জরার পিছনে যে সব মৌল কারণগুলি আছে বলে মনে করা হচ্ছে তাদের মধ্যে আছে— ক্ষতিগ্রস্ত জীবদেহের ঝিল্লির মধ্য দিয়ে এনজাইমের অনিয়ন্ত্রিত অপচয়, কোষ অণুর সংকর মিশ্রণ, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ থেকে নিউরোট্রান্সমিটার নির্গমনের বাধা, হরমোনের ক্ষয় প্রভৃতি।

কেন বার্ধক্য—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আণবিক জীববিজ্ঞানীরা মোটামুটি ষাটের দশক থেকে বার্ধক্যের সঙ্গে দেহকোষের সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সরলতম প্রাণী অর্থাৎ এককোষীদের জীবনে বার্ধক্য নেই। এককোষীরা কোন সময়ে জীবন শুরু করে—বৃদ্ধ হয়ে—জীবন শেষ করে না। তাদের জীবন প্রবাহমান। একটি কোষ ভেঙ্গে দুটি কোষ, দুটি কোষ থেকে চারটি কোষ—এভাবে চলে তাদের জীবনের ধারাবাহিকতা। কোন একটি কোষ বিচ্ছিন্নভাবে

জরাগ্রস্ত হয় না।

বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। গোটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে গোটা দেহ, আর গোটা দেহ গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোষ দিয়ে। বহুকোষী প্রাণীদেহে বহু কোষ একত্রে জীবনের রথ চালায়। কোষগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেহের স্বাস্থ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। বার্ধক্যে এই সম্পর্ক ব্যাহত হয়।

একটা জিনিস গোড়া থেকে লক্ষ্য করা গেছে। কম ওজনের স্তন্যপায়ী জীবের হৃদ্স্পন্দনের হার দ্রুত। একটা ইঁদুরের হৃদ্‌যন্ত্র যেখানে প্রতি মিনিটে প্রায় আটশ বার স্পন্দিত হয়, সেখানে একটি হাতির হৃদ্‌যন্ত্র কাঁপে প্রতি মিনিটে মাত্র কুড়ি বার। ইঁদুর বাঁচে প্রায় চার বছর, হাতি সত্তর বছর। হৃদ্স্পন্দনের হার দ্রুত হওয়ার অর্থ দ্রুত বার্ধক্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। যত তাড়াতাড়ি জীবরাসায়নিক ক্রিয়াগুলি ঘটে যাবে তত দ্রুত সেই দেহ জরাগ্রস্ত হবে। ইঁদুর, খরগোস, ঘোড়া, হাতিদের নিয়ে এই নিয়ম মানুষের বেলায় খাটে না। মানুষ ব্যতিক্রমী প্রাণী। কেন এই ব্যতিক্রম তার উত্তর পরিষ্কারভাবে দেওয়া যায়নি। তবে এটা বোঝা যায় যে দেরিতে হলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের দেহকোষে এমন কিছু পরিবর্তন আসতে থাকে যাতে দেহশৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়।

জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির প্রতি পদে উৎসেচক বা এনজাইমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শরীরকে গড়তে হলে বা শরীর দিয়ে ঠিকঠাক কাজ করাতে হলে চাই প্রোটিন। এনজাইমও প্রোটিন। একটি মাত্র এনজাইমের অভাবে জীবরাসায়নিক বিক্রিয়ার শৃঙ্খল ভেঙ্গে যেতে পারে।

ধরা যাক, শর্করাকে আত্মস্থ করে যে উৎসেচক তার নাম গ্লুকোকাইনেস। এই উৎসেচক ইনসুলিন হর্মোনকে উদ্দীপিত করে। প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় থেকে যে এই বিশেষ পদার্থটি উৎসারিত হচ্ছে তার গোপন নির্দেশ দিচ্ছে একটি বিশেষ ডি এন এ অণু। ডি এন এ'র পথনির্দেশে সব কিছু ঠিকঠাক চললেও একদিন না একদিন ডি এন এ ভুল করে ফেলে। মানুষের বয়স যত বাড়ে তত ডি এন এ'র ভুল হতে থাকে। ডি এন এ কোড ঠিক মতো আর অনুসৃত হয় না, মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে। দীর্ঘজীবনের শেষের দিকে তাই দেহে ভুল প্রোটিন, ভুল উৎসেচকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষে একদিন সঠিক ও

প্রয়োজনীয় জীবরাসায়নিক পদার্থের অপ্রতুলতায় জীবনের দায়বদ্ধ কাজ আর করা হয়ে ওঠে না—দেহ হয়ে পড়ে নড়বড়ে, আসে বার্ধক্য।

এখন প্রশ্ন হলো—জীবনের শেষে এসে ডি এন এ কাজে ভুল করে কেন। নিউইয়র্কের ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যবরেটরীর ডাঃ হাওয়ার্ড কার্টিস এর জন্য নানান রশ্মিকে দায়ী করেছেন। পরিবেশও খানিকটা দায়ী বলা যেতে পারে। এমনিতে, ডি এন এ অণুর স্থায়িত্ব বেশ কম— নানা কারণে ডি এন এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশ্য প্রকৃতি আমাদের একেবারে অসহায় করে রাখেনি। নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলি জেনেটিক ব্যবস্থার মধ্যে আছে। যখন যা ত্রুটি ঘটে তা যতটা সম্ভব সংশোধন করে নেওয়া হয়। যে মানুষের মধ্যে জিনঘটিত এই ত্রুটিকে সারাবার ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হবে, তার দীর্ঘজীবী হবার সম্ভাবনা তত বেশি।

চারধারের পরিবেশ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গ, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, রাসায়নিক দূষণ, শব্দ ও উত্তেজনা। এরা সবাই কিছু-না-কিছু ত্রুটি ঘটাচ্ছে কোষ বিভাজনে। যেমন, যাঁরা অতিরিক্ত সূর্যালোকে থাকেন তাঁরা অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে একধরনের চর্ম-ক্যান্সার (xeroderma pigmentosum) দ্বারা আক্রান্ত হন। অতিবেগুনী রশ্মি চামড়ার কোষের ডি এন এ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে চামড়ায় ক্যান্সার করে। শীতের দেশের মানুষের শরীরে এই রোগ দেখা দিলেও উষ্ণ দেশের মানুষেরা এক ধরনের উৎসেচক দিয়ে ডি এন এ-কে সারিয়ে তুলে আত্মরক্ষা করে।

ডাঃ কার্টিস তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। ইঁদুরের উপর নানান ধরনের রশ্মি প্রয়োগ করে তাদেরকে অকাল বার্ধক্যে ঠেলে দিয়েছিলেন কার্টিস। সাধারণত, আমাদের মারাত্মক রশ্মির মুখোমুখি হতে হয় না। মহাকাশ থেকে যে অতিবেগুনী রশ্মি আসছে তাকে উর্ধাকাশের ওজোন গ্যাসের স্তর আটকে দেয়।

বিজ্ঞানীরা আবার লক্ষ্য করেছেন, দেহের সব রকমের কোষ একই গতিতে বিভাজিত হয় না। রক্ত, চামড়া ইত্যাদির কোষ দ্রুত জন্ম নেয়—লোহিত কণিকার আয়ু মাত্র চার মাস। আবার পেশীকোষের নবীকরণ হতে বেশ সময় লাগে। একমাত্র মস্তিষ্কের কোষ ছাড়া বাকি সব কোষই কম বেশি সময়ের

ফারাকে নতুন করে জন্ম নেয়।

শুধু রশ্মিই যে ডি এন এ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের মুক্ত মূলকগুলিও (free radical) এ কাজে পটু। রসায়নের ছাত্র মাত্রই জানেন যে মুক্ত মূলকগুলি রাসায়নিকভাবে অতি সক্রিয়। মুক্ত মূলকগুলি অন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শরীরের মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। এতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। মুক্ত মূলকগুলি দেহের উৎসেচক, হরমোন, লিপিড, ডি এন এ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিকল করে দেয়।

নানা কারণে শরীরের মধ্যে মুক্ত মূলকের জন্ম হয়। জীবরাসায়নিক যৌগগুলি খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুক্ত মূলকগুলির জন্ম দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার , জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্সিজেনও মুক্ত মূলক তৈরি করতে পারে!

জীবের মূল উপাদান প্রোটিন এবং সকল প্রোটিন গঠিত হয়েছে মাত্র কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সমবায়ে। বিভিন্ন জীবের মধ্যে বা একই জীবের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিনে যে পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি– তা মূলত অ্যাসিডের সমবায়ে পার্থক্য। অর্থাৎ, জীবগত বির্বতনের মূল ভিত্তি হলো প্রোটিনের পার্থক্য। প্রোটিনগুলি জিন বা বংশাণুর নির্দেশে গঠিত হয়।

সাধারণভাবে বলা হয় যে ক্রোমোসোমের ফিতের উপর দানা দানা আকারে বংশাণু ছড়িয়ে থাকে। ভালো অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রোমোসোম (অবশ্য রাঙিয়ে নিলে) দৃশ্যমান হলেও বংশাণু নজরের আড়ালে থাকে, কারণ তা আরো ক্ষুদ্র। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, ক্রোমোসোমে আছে প্রধানত ডি এন এ, প্রোটিন। এই ডি এন এ-গুলিই প্রোটিন গঠনের সংকত দেয়। ডি এন এ-র দ্বিতন্তুর দৈর্ঘ খুবই বেশি। মানুষের দেহের মধ্যে একটি কোষে যতটা ডি এন এ থাকে তা লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। বোঝাই যাচ্ছে, মানবদেহের যাবতীয় ডি এন এ-কে পর পর জুড়লে তা কত লম্বা হবে।

ডি এন এ দ্বিতন্তুর যতটুকু অংশ প্রোটিনের মধ্যের একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জা গঠনের ইংগিত দেয় তাই জিন বা বংশাণু। অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে প্রোটিনের ধর্মের পরিবর্তন। কোটি কোটি বছর ধরে মাত্র কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন তৈরি হয়ে আসছে।

ত্রিশ কোটি বছর আগেকার ফসিলকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে তাদের প্রোটিনও আজকালকার অ্যামিনো অ্যাসিড় অর্থাৎ গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন, লিউসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। মানুষের দেহে যে সব অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, একটা ডাইনোসরের দেহেও তাই ছিল।

বংশাণুর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। বংশাণুর গঠন ও অবস্থান খুবই স্থায়ী প্রকৃতির। চট্ করে অথবা সামান্য কোন কারণে বংশাণুর অদল-বদল হয় না। বংশাণুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি জীবিতের দেহে ও আচরণে এতই গভীরভাবে প্রোথিত যে প্রজাতির কোন এক পুরুষ ভিন্ন আচরণ করলেও তা বংশবৈশিষ্ট্যে স্থায়ী দাগ কাটে না। সমাজ ও প্রকৃতির আশুপরিবেশ যে সব অভ্যাস জীবিতের উপর আরোপ করে তা বংশধররা বহন করে না। যে কারণে অন্ধ মানুষের সন্তান অন্ধ হয় না বা দুর্ঘটনায় পা হারানো মানুষের সন্তান পঙ্গু হয় না, সেই একই কারণে নিরক্ষর মানুষের সন্তান নিরক্ষর হয় না বা অপরাধীর সন্তান অপরাধী হয় না। যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলাত্র বংশাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তারাই কেবলমাত্র সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়।

বংশাণু কত গভীরভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে! এক-একটা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কি গভীর ঐক্যই না বিরাজ করে! তাদের বসার ভঙ্গী, তাকানোর পদ্ধতি, হাত নাড়ার বিশেষত্ব থেকে শুরু করে সামান্য সামান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্য—যেমন নাকের ভাঁজ, চুলের বিস্তৃতি, আঙুলের গঠন— সবই অদ্ভুত এক রকমের! পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের, মাতামহীর সঙ্গে দৌহিত্রীর কি প্রচণ্ড মিল আমরা মাঝে মাঝে দেখি, দেখে চমকে উঠি। এরা সবই বংশাণুর কাছে দায়বদ্ধ। স্বভাব-চরিত্র বংশাণু নামক পরমাণুগুচ্ছ দ্বারা বাহিত হয়ে বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই, শেষ বিচারে মানুষের স্বভাবের এক বড় অংশ বংশাণু-নির্ভর, বস্তুনির্ভর।

তবু মাঝে মাঝে ভুল হয়। বহিঃস্থ প্রভাবে বংশাণুর গঠন পালটে যায়। এই প্রভাবগুলি কি? নানা ধরণের রশ্মি, যেমন অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির প্রভাবে ক্রোমোসোমে পরিব্যক্তি ঘটে। মহাকাশ থেকে নানা রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। এদের একটা বড় অংশ ওজোনোস্ফিয়ার আটকে দিলেও কিছুটা প্রাণী ও উদ্ভিদ

জগতের উপর পড়ে। মহাজাগতিক রশ্মি কোন সময় বাড়ে, কোন সময় কমে। এর পিছনে মহাকাশের বিধি-ব্যবস্থাগুলি কাজ করে। যখনই অত্যাধিক মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে ধেয়ে আসে তখন পরিব্যক্তিও হয় অত্যাধিক। পৃথিবী নিজেও একাধিক রশ্মির উৎস। এদের সম্মীলিত প্রভাবে হঠাৎ হঠাৎ জিনের পরিবর্তন ঘটে। তরুণ বয়সে জিনের তবু যতটুকু প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে, বার্ধক্যে থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে জিনের পরিবর্তন ঘটলেও তার বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে, জিনের পরিব্যক্তি এবং ক্রোমোসোমের পুনর্বিন্যাস একটি নির্দিষ্ট হারে ঘটে বলে বিজ্ঞানীরা মানেন।

রশ্মির প্রভাবের পাশে পাশে উত্তাপ পরিব্যক্তিতে একটা বড় ভূমিকা নেয়। নানা কারণে পরিবেশের উত্তাপ কমে-বাড়ে। নানান রাসায়নিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পরিব্যক্তিতে ভূমিকা নেয়।

মানুষের জীবনে যত দিন যায় ডি এন এ-র গঠনে সামান্য অদল-বদল হয়। ফলে প্রত্যাশিত প্রোটিনগুলি নিয়মিত উৎপাদিত হয় না, দেহাভ্যন্তরে জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির একাংশ কখনও থমকে যায়— তাদের ছন্দপতন ঘটে। কখনও ক্ষুধা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা, কখনও খাদ্যশোষণের ব্যবস্থা, কখনও দৈহিক শক্তিসংগ্রহের ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে— বার্ধক্য আসে।

বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে মানুষ অন্যতম। মানুষের জীবন শুরু হয় জন্মদিনের অনেক আগে। যে মুহূর্তে মাতার গর্ভস্থ ডিম্বের সঙ্গে পিতার শুক্রকীটের মিলনে ভ্রূণ সৃষ্টি হল, তখন থেকে শুরু হলো মানুষের জীবন।

মানুষের সুদীর্ঘ জীবনে কত রকমের পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। তবে সব থেকে বড় পরিবর্তন হলো তার দেহের বৃদ্ধি এবং দেহের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন।

ভ্রূণকোষ বাড়তে থাকে অর্থাৎ কোষ বিভাজন চলতে থাকে। পুরানো কোষ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুন কোষ তৈরি হয়। শেষে একদিন ভ্রূণ একটি পূর্ণ মানুষের আকার পায়। বাড়ন্ত বয়সে মানুষের দেহ বাড়ে অর্থাৎ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ মোটামুটিভাবে তার দেহের

দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, ওজনে একরকম থাকে। নতুন কোষের জন্ম হয়, পুরানো কোষ সরে গিয়ে নতুন কোষের জায়গা করে দেয়।

এক সময় মনে করা হতো–কোষ অমর এবং ক্রমাগত ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নতুন নতুন কোষের জন্মের মধ্য দিয়ে কোষ অমরত্বের আস্বাদ পায়। বিজ্ঞানী লিওনার্ড হেফ্লিক আমাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। বিশিষ্ট সাইটোলজিস্ট হেফ্লিক দীর্ঘকাল আমেরিকায় কোষ-বিভাজনের উপর গবেষণা করেছেন। ক্যান্সার কোষ যে অনিয়মিত ভাঙ্গনের শরিক, ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি যে উল্লম্ফন পদ্ধতিতে– তা বিজ্ঞানীদের অজানা নয়। হেফ্লিকও ক্যান্সার কোষের বিভাজন নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

হেফ্লিক একটা দারুণ কথা বললেন। তিনি জানালেন, সাধারণ ও সুস্থ কোষ নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। তাদের বিভাজনের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে নিয়মিত। একটি কোষ পঞ্চাশবারের বেশি বিভাজিত হবে না–এটা জানালেন হেফ্লিক। কোষ বিভাজনের গুপ্তকোড লেখা আছে কোষের অভ্যন্তরে। কোষের ডি এন এ– যা কোষ বিভাজনকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তার মধ্যের বিভাজনের সংকেত এই বলে দেয় যে পঞ্চাশবারের বেশি ঐ কোষ বিভাজিত হবে না। তারপর কোষের মৃত্যু ঘটবে।

যে কোষের ডি এন এ বিভাজনজনিত নিয়ন্ত্রণের কোড হারিয়ে ফেলে সে-ই অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজনের পর বিভাজন চালিয়ে যায়, অপ্রয়োজনীয় কোষের পাহাড় গড়ে তোলে। এটাই ক্যান্সার কোষের বৈশিষ্ট্য।

ডি এন এ'র এহেন ত্রুটি শেষ বয়সে বেশি দেখা দেয়। দীর্ঘজীবনে একজন মানুষ নানান রশ্মি, উত্তাপ, রাসায়নিক পদার্থের মুখোমুখি হয়, দূষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয় দীর্ঘ দিন। এদের সম্মীলিত প্রভাবে একদিন ডি এন এ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আয়ু যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বহু যুগ ধরে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণী যে আণবিকগঠন লাভ করেছে তা যেমন একদিকে তাকে জীবনযাত্রার উপযোগী করেছে, অন্যদিকে তা মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী ঘোষণা করেছে। বস্তুতপক্ষে, জন্ম-জীবনযাত্রা-মৃত্যু সবকিছুর পিছনে ডি এন এ'র অঙ্গুলীসংকেত কাজ করে। একটি প্রজাতির আয়ু নির্ধারিত হয়

নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে।

প্রথমত, বংশাণুগুলি কত সঠিকভাবে এনজাইম তথা প্রোটিন তৈরি করার নির্দেশ দিতে পারে, বহিঃস্থ প্রভাবকে কাটিয়ে বংশাণুগুলি কতটা ক্রিয়াশীল এবং বংশাণুর কোড-ভাষা কত সুচারু উপায়ে জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া মারফৎ দেহের কোণে কোণে প্রচারিত হয় তা আয়ুর প্রশ্নে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, কোন একটি ভুলকে যদি বংশাণু প্রতিহত করতে না পারে তাহলে ভুলের পরে ভুল চক্রবৃদ্ধিহারে হতে থাকবে। ত্রুটিযুক্ত একটি বংশাণু যদি কাজ করতে না পারে অর্থাৎ নির্দিষ্ট এনজাইমটি তৈরি করতে না পারে তাহলে ঐ এনজাইমের দ্বারা সংঘটিত নির্দিষ্ট জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াটি ঘটবে না। জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াটি না ঘটলে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটবে, শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে, অর্থাৎ বার্ধক্যের চিহ্ন ফুটে উঠবে।

তৃতীয়ত, হেফ্লিকের মত অনুযায়ী কোন কোষ পঞ্চাশ বারের বেশি বিভাজিত হবে না। শরীরের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোষ পঞ্চাশবার বিভাজিত হবার পর লুপ্ত হয়ে গেলে সেই কোষের ঘাটতি দেখা দেবে শরীরে। শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থায় –কোষ ও) – কোষের গুরুত্বের কথা আমরা জানি। টি-কোষ ও বি-কোষ কমে গেলে সংক্রামক রোগের আক্রমণ বাড়বে।

হেফ্লিকের নিয়মানুযায়ী প্রতিরোধী ব্যবস্থার আসল কোষগুলির সংখ্যাহ্রাস হতে থাকে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে। বৃদ্ধ বয়সের মানুষের দেহস্থ অনেক কোষই হেফ্লিক সীমানার আওতায় পড়ে। স্বভাবত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শারীরিক প্রতিরোধ ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। সাধারণ অসুখ-বিসুখ, ঠাণ্ডা লাগা, কাশি, সংক্রামক ব্যাধি তাকে সহজে কাবু করে দেয়।

চতুর্থত, মস্তিষ্কের কোষগুলি যখন ক্ষতিগ্রস্থ ডি এন এ–র এবং হেফ্লিক সীমানার আওতায় পড়ে তখন অবস্থাটা আরো জটীল হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দৌর্বল্য, মানসিক অস্থিরতা তথা বাহাত্তুরে দেখা যায়। এর পিছনে কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে? যদিও একথা ঠিক যে নিউরণ দীর্ঘজীবী এবং সেজন্য মানুষ দীর্ঘকাল মস্তিষ্কজনিত কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তবু এটা সত্য যে ডি এন এ'র ত্রুটি মস্তিষ্কের জীবরাসায়নিক ক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয় এবং স্মৃতিবিভ্রম, হাত পা কাঁপা প্রভৃতি নিউরোব্যাধি বৃদ্ধ মানুষকে

আক্রমণ করে ।

পঞ্চমত, হেফ্লিকের সীমানা মানার জন্য শরীরের নানা অংশে কোষের ঘাটতি দেখা দেয় এবং এই ঘাটতি বিশেষ করে চামড়া, অস্থিমিলন অংশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে । চামড়ার ভাঁজ বা অস্থিমিলন অঞ্চলে স্থিতিস্থাপকতাহীনতার কারণ এটাই ।

ষষ্ঠত, উপরোক্ত কারণগুলির জন্য নিরীহ ও ক্যান্সারযুক্ত টিউমার, রক্তক্যান্সার প্রভৃতি ব্যাধি বৃদ্ধ বয়সে বেশি দেখা দেয় ।

অনেক কাল আগে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা ছিল । সেই ধারণা হলো এই যে দেহের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে । এই এমন কিছু যে আদতে রাসায়নিক পদার্থ তা অনেকে সন্দেহ করতেন । ক্রমে কতগুলি গ্ল্যান্ডের উপর সন্দেহ ঘনীভূত হলো । মানবশরীরে এমন কিছু গ্ল্যান্ড আছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তাদের কোন ভূমিকা নেই । এই গ্ল্যান্ডের ক্ষরণ হয়, কিন্তু ক্ষরিত রস কোন নালীপথে এসে রক্তে মেশে না । বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করলেন, এরা হয়তো এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তরলকে নিঃসরণ করে যা সরাসরি এসে রক্তে মেশে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । আলোচ্য তরলের নাম হর্মোন ।

হর্মোনের কাজ হলো বার্তা বহন করা । কোষ হতে কোষে নিঃশব্দে হর্মোন প্রবাহিত হয়, কোষকে জাগায়, তাদের কর্মঠ করে তোলে । এ একরকমের সঞ্জীবনী শক্তি । যেমন ভোরের আলো জাগিয়ে তোলে গ্রাম ও লোকালয়কে, তেমনি হর্মোন জাগিয়ে তোলে দেহযন্ত্রকে ।

হর্মোন-রসকে উৎসারিত করার জন্য শরীরের নানা স্থানে গ্রন্থি আছে । মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে আছে পিটুইটারী, গলদেশে আছে থায়রয়েড, বুকে আছে থাইমাস, কিডনির পাশে অ্যাড্রেনাল, পেটে প্যানক্রিয়াস, ·তলপেটে ওভারি বা অন্ডকোষ । অন্তঃক্ষরণের এই গ্রন্থিগুলি হর্মোনের নিঃসরণের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজ করে । গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারীর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । বলতে গেলে, পিটুইটারী সমস্ত শরীরের যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে । মাথার ভিতরে খুব সুরক্ষিত অবস্থায় পিটুইটারী গ্রন্থি থাকে । পিটুইটারী বেশ

গুরুত্বপূর্ণ হর্মোন-গ্রন্থি, তাই প্রকৃতি তার নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশ সচেতন। পিটুইটারী কম করে ছ' রকমের রস নিঃসরণ করে — এরা প্রত্যেকেই প্রোটিন। এই হর্মোনগুলি অন্য সব গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। পিটুইটারী থেকে ভেসে আসা থায়রয়েড উদ্দীপক হর্মোন থায়রয়েড গ্ল্যান্ডকে জাগিয়ে দেয়, এর ফলে থায়রয়েড হর্মোনের নিঃসরণ সম্ভব হয়।

পিটুইটারী যে সব হর্মোন উৎপাদন করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল "বৃদ্ধি হর্মোন"। পিটুইটারী যৌন হর্মোনগুলিকে নিঃসরণে সাহায্য করে। পিটুইটারী গ্রন্থি কতটা সক্রিয় তা সরাসরি বোঝার কোন পথ নেই। কিন্তু অন্য গ্রন্থিগুলির সক্রিয়তা মাপা সম্ভব। পিটুইটারী হর্মোনকে কৃত্রিমভাবে শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা অন্য গ্রন্থিগুলিকে কিভাবে ও কতটা প্রভাবিত করে তা পরীক্ষামূলকভাবে দেখা হয়েছে। আর একটা উপায় আছে।

কোন একটি বিশেষ গ্রন্থির কার্যকারীতা বোঝার জন্য মূত্রকে পরীক্ষা করা যায়। গ্রন্থি থেকে আগত হর্মোন শারীর ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথে স্তরে স্তরে খন্ডিত বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই উপজাতগুলি মূত্রের মধ্য দিয়ে শরীরের বাইরে চলে আসে। মূত্রে হর্মোনের উপজাতের পরিমাণ নির্ণয় করলে মূল হর্মোনের পরিমাণ অর্থাৎ গ্রন্থির সক্রিয়তা জানা যায়।

বিভিন্ন বয়সের মানুষের মূত্রকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানুষের বয়স যত বাড়ে তত হর্মোনের ক্ষরণ কমে আসে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি যে বৃদ্ধ মানুষের দেহে কমজোরী তার প্রমাণ এভাবেই পাওয়া গেছে। বৃদ্ধের দেহে কৃত্রিম উপায়ে কিছুটা পিটুইটারী হর্মোন প্রবেশ করালে তা গিয়ে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সকে উত্তেজিত করে, এবং তার ফলে অ্যাড্রেনালের ক্ষরণ কিছুটা বাড়ে।

সবাই জানেন, অ্যাড্রেনাল থেকে জাত হর্মোনগুলিকে "স্ট্রেস-হর্মোন" বলে। অর্থাৎ এই হর্মোন মানুষকে উত্তেজিত করে, রক্তচাপ বাড়ায়, আবেগী করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে উত্তেজনা, প্রগলভতা ও আবেগের ঘাটতি থাকে —এটা যে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তার জন্য তা বোঝা যায়।

তাই বলে সমস্ত গ্রন্থি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিক্রিয় হয়ে পড়ে না। এমন অনেক হর্মোন নিঃসরণকারী গ্রন্থি আছে যারা যুবা ও

বৃদ্ধদের প্রতি সম-আচরণ করে। যেমন থায়রয়েড গ্রন্থি। পিটুইটারীর উত্তেজনা একই ভঙ্গীতে ও পদ্ধতিতে যুব-বৃদ্ধদের থায়রয়েডকে উদ্দীপিত করে। বৃদ্ধদের শরীরে থায়রয়েড সমানভাবে সক্রিয়, সমান তালে থায়রক্সিনকে নিঃসরণ করে।

আবার এও লক্ষ্য করা গেছে, শরীরে কৃত্রিমভাবে ইনসুলিন ও শর্করা প্রবেশ করালে ইনসুলিন শর্করাকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে, রক্ত থেকে শর্করা দ্রুত অপসারিত হয়ে যায়। তবে যুবাদের শরীর থেকে যত তাড়াতাড়ি শর্করা চলে যায়, বুড়োদের বেলায় যেতে দেরি হয়।

এখান থেকে যুব ও বৃদ্ধদের শারীরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা যায়। বয়স বাড়া বা বৃদ্ধ হওয়ার অর্থ — প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার হ্রাস। একজন যুবক যত তাড়াতাড়ি ইনসুলিন ব্যবহার করে শর্করাকে হজম করে নেবে, একজন বৃদ্ধ মানুষ তা পারবে না। শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের বেশি।

আরো এগিয়ে একথা বলা যায়, শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রাখা এবং শরীরকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ঠিক রাখার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম বয়সে বেশি থাকে।

এনজাইম সৃষ্টির পিছনে ডি এন এ'র হাত আছে— একথা আমরা আগে বলেছি। ডি এন এ' ক্রটি এনজাইম সৃষ্টিতে বাধা দেয়— একথাও বলা হয়েছে। এনজাইমের অবস্থান ও সক্রিয়তার প্রসঙ্গে হর্মোনের ভূমিকা আছে।

একটা কথা। এনজাইমগুলি যেমন শারীরিক রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, হর্মোনগুলির ভূমিকা কিন্তু তেমন নয়। কোন বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে হর্মোন এগিয়ে আসে না। এমনও হতে পারে যে হর্মোনগুলি এনজাইমকে প্রভাবিত করে, হয়তো তারা এনজাইমকে প্রয়োজন মতো উদ্দীপ্ত করে বা নিস্তেজ করে দেয়। স্বভাবতই, বৃদ্ধের শরীরে হর্মোনের ঘাটতি হলে তা এনজাইম-ঘাটতি ঘটিয়ে দেবে—ফল একই, অর্থাৎ স্বাস্থ্যহানি।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে সুখ শান্তি আর কতটুকু ? তবু কিছুটা সান্ত্বনা তারা পেতেন যদি ঘুমটুকু থাকতো। যতক্ষণ ঘুম ততক্ষণ শান্তি। কিন্তু শরীর যে তাতেও বাধ সাধে। বয়স বাড়ার সঙ্গে

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুম কমতে থাকে। মধ্যরাত্রিতে অনিদ্রায় আক্রান্ত বৃদ্ধ ভাবেন—হায়, যখন যুবক ছিলাম তখন কত শান্তিতে ছিলাম। এলিয়ে পড়তে পারলেই হতো, ঘুম আসতো আপনা-আপনি।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার শরীরে জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি যত দুর্বল হতে থাকে তত তার বহির্লক্ষণ ফুটে ওঠে। যেমন ঘুমের ক্ষেত্রে।

ঘুম হতে হলে স্নায়ুর উত্তেজনা থাকলে চলবে না। স্নায়ু উত্তেজনার ব্যাপারটা শুধু ইলেকট্রিক্যাল নয়, কেমিক্যালও। তাই ঘুম আনার ব্যাপারে রাসায়নিক বড়ির দক্ষতা সর্বজনবিদিত। অনেকদিন আগে থেকেই সিডেটিভ চালু আছে। মরফিন এমনই একটা জিনিস। মরফিন নামটাই এসেছে "ঘুমের" গ্রীক শব্দ থেকে।

এসব কারণে আধুনিক নিদ্রাবিজ্ঞানীরা ঘুমের সঙ্গে প্রাণরাসায়নিক যৌগগুলির সম্পর্ক খুঁজতে শুরু করেন। এ বিষয়ে শারীরতত্ত্ববিদ জি. এফ. রোসির প্রতিবেদন মনে রাখার মতো।

রোসির প্রতিবেদন বহুলাংশে ঘুমের রাসায়নিক ব্যাখ্যার অনুরূপ। দীর্ঘ জাগরণে বা নিদ্রায় আমাদের শারীরিক বিপাকীয় ক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটে। ঘুমে ও জাগরণে রক্ত, মূত্র প্রভৃতি তরলের সংগঠন, বিভিন্ন গ্রন্থির নিঃসরণের মাত্রার পার্থক্য ঘটে। অনুমান করা হচ্ছে যে দেহকে জাগরিত রাখতে হলে কোন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক পদার্থটির অভাব হলে ঘুম আসে এবং ঘুম-বিশ্রামের মধ্য দিয়ে আবার তা সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত হলে শরীর ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এমনও মনে করা হচ্ছে যে জাগরণে শরীরে কোন মৃদু বিষের সঞ্চয়ন হয় এবং এই বিষ ঘুমের মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষের শরীরে মুক্ত মূলকের সঞ্চয়ন, প্রয়োজনীয় এনজাইম ও হর্মোনের ঘাটতি প্রয়োজনীয় অনেক প্রাণরাসায়নিক পদার্থের যেমন অভাব ঘটায় তেমনি শরীরের অনেক বিষকে দূর করতে ব্যর্থ হয়। ফলত, জটীলতার পর জটীলতা, অনেক অস্বাচ্ছন্দ্য ডেকে নিয়ে আসে, যাদের মধ্যে নিদ্রাহীনতা অন্যতম।

ঘুমের অভাব নানান ব্যাধিকে ডেকে আনে। বস্তুতপক্ষে, ঘুম কোন কোন ব্যাধির প্রশমনের কারণ। অন্তত সেই

ব্যাধিগুলিকে বৃদ্ধেরা ঘায়েল করতে প্রায় পারেন না। ঘুমপাড়ানি চিকিৎসা ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার নিরাময় করেছে বলে শোনা গেছে। আর কে না জানে– ডায়াবেটিস, আলসার প্রভৃতিরা বৃদ্ধের সদাসঙ্গী!

ঘুম নিয়ে বৃদ্ধদের যেমন সমস্যা, তেমনি সমস্যা স্মৃতিকে নিয়ে। নতুন কিছু শিখতে অপারগ–এটাই সাধারণভাবে বয়স্ক মানুষদের চরিত্র। শিখলেও ভুলে যায় তারা, পুরানো কথা মনে রাখতে না পারা– এটাও তাদের ক্ষেত্রে খুব দেখা যায়।

অনেকদিন আগে, অর্থাৎ ১৯০৪ সালে ফরাসী শারীরতত্ত্ববিদ রিচার্ড সিমঁ স্মৃতির উৎসকে রাসায়নিক বলেছিলেন। যখন আমরা কোন কিছু শিখি বা মনে রাখি, তখন তুল্য পরিমাণ রাসায়নিক পরিবর্তন মস্তিষ্কে ঘটে যায়। একে তিনি engram বলেছিলেন।

১৯৫০ সাল নাগাদ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক ওয়ার্ড হেলস্টেড বললেন যে স্মৃতির পিছনে নিউরণের নিউক্লিক অ্যাসিডের আণবিক রূপান্তর কাজ করছে। এ রকম চিন্তা করার কারণ ছিল। ডি এন এ অণুর বিষয়ে নবলব্ধ জ্ঞানই ছিল কারণ।

বলতে পারা যায়, ডি এন এ অণুও একরকম স্মৃতি বহন করে –বংশের স্মৃতি, পূর্বপুরুষের স্মৃতি। সারা জীবনে আমাদের যতটা স্মৃতির বোঝা বয়ে নিয়ে চলতে হয়, তাতে আণবিক স্তর ব্যতীত অন্য কোথাও তা ধারণ করা সম্ভব নয়।

১৯৫৯ সালে সুইডিশ নার্ভ বিশারদ ডাঃ হোলগার হাইডেন স্মৃতির রাসায়নিক তত্ত্বকে নতুনভাবে বিজ্ঞানীদের সমাবেশে উপস্থিত করেন। মস্তিষ্কের কোষ বের করে, তার মধ্য থেকে আর এন এ'র (যা প্রোটিন বানাতে সাহায্য করে) মাত্রা নির্ণয় করার পদ্ধতি হাইডেন আবিষ্কার করেন। শুধু তাই নয়, নিউরণের মধ্যে কি পরিমাণ উৎসেচক-সক্রিয়তা আছে তাও তিনি মেপেছিলেন। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন, আর এন এ অণুর "বেস সিকুয়েন্সের" পরিবর্তন ঘটিয়ে স্মৃতির "জন্ম" হয়। যখন কোন কিছুকে স্মৃতিতে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা মাথায় গ্রহণ করি (বা শিখি), তখন যে নার্ভের স্পন্দন মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় তা তড়িতরাসায়নিক বিক্রিয়া মারফৎ আর এন এ অণু একটি নতুন প্রোটিন তৈরি করে, যাকে আমরা "স্মৃতিপ্রোটিন" বলতে পারি। স্মৃতিপ্রোটিন মস্তিষ্কে

চিরস্থায়ী বাসা বানায়, স্মৃতির কোটর গড়ে তোলে।

হাইডেনের স্মৃতি বিষয়ে আর এন এ তত্ত্বকে সমর্থন করতে বৃদ্ধদের নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। বার্ধক্যের একটি স্তরে স্মৃতিশক্তি ভীষণভাবে কমে যায়। এমন ধরনের কয়েকজন বৃদ্ধ রোগীর উপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে আর এন এ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এদের স্মৃতির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। ইঁদুরের দেহে আর এন এ ইনজেকশন করে তাদের ট্রেনিং দেওয়া সহজ হয়েছিল। কৃত্রিমভাবে আর এন এ প্রাপ্ত ও আর এন এ বঞ্চিত দুই দল ইঁদুরে পার্থক্য করা যেত সহজে। বিপরীত পদ্ধতিগুলিও পরখ করা হলো। যেমন 8–azaguanine নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে–এটি মস্তিষ্কের আর এন এ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঁদুরের শরীরে 8–azaguanine প্রয়োগ করে দেখা গেল, যা শিখেছিল তা তারা ভুলে গেছে!

মোদ্দা কথা হলো, বার্ধক্যের পিছনে জীবরাসায়নিক কারণ আছে। কোষের অভ্যন্তরে সেই কারণগুলি নানাভাবে লুকানো থাকে, বয়স হলেই বেরিয়ে পড়ে। কখনও এনজাইমের ঘাটতি, কখনও হর্মোনের অভাব, কখন প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করতে না পারা (যার জন্য অবশ্য ডি এন এ ও আর এন এর ত্রুটিকে দায়ী করা যেতে পারে) প্রভৃতি কারণে প্রয়োজনীয় কাজগুলি শরীরের পক্ষে আর করা হয়ে ওঠে না। হেফ্লিক সীমার জন্যই হোক, অথবা পরিবেশের প্রভাবের জন্যই হোক প্রত্যাশিত কোষবিভাজন হয় না। হয় কোষ বিভাজন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, অথবা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বিভাজন চলতেই থাকে। ফলে ঘুম, স্মৃতি চলে যায়, হজমে গোলমাল দেখা দেয়, শারীরিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে, ক্যান্সার দেখা দেয়, শক্তির অভাব দেখা দেয়, শরীরের নমনীয়তা কমে গিয়ে ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়। জীবরাসায়নিক বিজ্ঞানীরা এ সব কিছুকে তাঁদের জ্ঞানের সাহায্যে সাধ্যমতো ব্যাখ্যা করেছেন।

এখন প্রশ্ন, বার্ধক্যের কারণ যদি জানা যায়, তাহলে তো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায়। বার্ধক্য প্রতিরোধ ?

তা-ও কি সম্ভব ?

বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণ কি সম্ভব

বার্ধক্য নিয়ে নানান তত্ত্বের মধ্যে একটা কথা ঘুরে ফিরে আসে — বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্ভব ?

সালসা, বটিকা বা স্বপ্নদত্ত কোন মাদুলী নয়, অকাল বার্ধক্য রোধের উপায় হলো নিয়মিত শ্রম, সুষম আহার, আনন্দময় আশাব্যঞ্জক জীবন। বার্ধক্য-নিয়ন্ত্রণের গবেষণা অবশ্য অন্যদিকেও চালিত হচ্ছে।

একদল বিজ্ঞানী মনে করেন যে দেহের মুক্ত মূলকগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে অবস্থার সুরাহা হতে পারে। তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার ইনস্‌টিট্যুট অব কেমিক্যাল ফিজিক্সের অ্যাকাডেমিসিয়ান এন এম ইমানুয়েল মুক্তমূলক-বিরোধী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের উপর তা প্রয়োগ করে তাদের আয়ু বাড়ানোর ব্যাপারে সুফলও পেয়েছেন। এনজাইমঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় অবশেষ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে মুক্তমূলক তৈরি হয়।

বার্ধক্য প্রতিরোধী রাসায়নিক দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমেই ভিটামিন-ই'র নাম করতে হয়। কারণ ক্রোমোসোমের বিকৃতির প্রতিরোধ করতে এবং জারণ বিক্রিয়াকে বিরোধিতা করতে ভিটামিন-ই খুবই সক্রিয় হতে পারে। গবেষকরা ভিটামিন-ই ছাড়া আরো কতগুলি জৈবপদার্থকে বেছে নিয়েছেন। যেমন, স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের লবণগুলি, ২-মারক্যাপটোইথাইল অ্যামিন, ইথিলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ জারণ বিক্রিয়ার বিরোধিতা করে মুক্তমূলক সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

শুধু যে ওষুধ-পত্র দিয়ে বার্ধক্যের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে তাই নয়, প্রয়োজন মতো দেহের অকেজো যন্ত্রপাতি দিয়ে, কৃত্রিম দেহাংশ দিয়ে জীবন দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। জীববিজ্ঞানী অলভিন সিল্‌ভারস্টেন বিশ্বাস করেন যে এই শতাব্দীর মধ্যেই কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র নিরাপদে ও অনায়াসে মানুষের

বুকে স্থান করে নিতে পারবে এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের সাহয্যে তা স্বাভাবিক হৃদ্‌যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারবে। এই শতকের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে– যার ফলে, ষাট বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের আর হৃদ্‌রোগজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকবে না, ক্যান্সারের মৃত্যু কমিয়ে বছরে দশ হাজার করা অসম্ভব হবে না।

বিজ্ঞানীদের কল্পনা–দেহের "স্পেয়ার পার্টস" নিখুঁত রাখার জন্য একটি গভীরভাবে হিমায়িত মজুত ভাণ্ডার বা ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা যাবে, যেমন এখন ব্লাড ব্যাঙ্ক, চক্ষু ব্যাঙ্ক আছে। শুক্রকীট, সেল, কর্ণিয়া, চামড়া, অস্থি ইত্যাদির ব্যাঙ্ক তৈরি তো ইতিমধ্যে আমরা করে ফেলেছি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ বাড়তে থাকে। কাজে আর তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না, একটুতেই ক্লান্তি আসে, ঝিমুনি দেখা দেয়। সন্দেহ নেই যে এই সব অনুষঙ্গগুলির কিছুটা মানসিক, বয়স্কের জীবন সম্পর্কে উৎসাহের অভাব থেকেই এদের জন্ম। মানসিক কারণ ছাড়া আর কিছু বস্তুগত কারণ আছে। ডায়াবেটিস, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি কারণগুলি আমাদের দুর্বল করে। তবে এগুলিও যথেষ্ট নয়। ভিটামিনের ঘাটতি আমাদের নিস্তেজ করে দেয়।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। তবু দু'একটা কথা বলতে হয়।

ভিটামিনগুলি শরীরকে সচল রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাদের একটুখানিই যথেষ্ট। ভিটামিন-এ'র অভাবে চোখের অসুখ দেখা দেয়, ভিটামিন ডি অস্থির পক্ষে প্রয়োজনীয়, বি শ্রেণীর ভিটামিন অনেকগুলি কারণে অপরিহার্য–এদের মধ্যে বৃদ্ধি, হৃদ্‌যন্ত্র ও নার্ভের কার্যকারীতা প্রধান। ভিটামিন বি১২ রক্তের স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ভিটামিন সি শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে মজবুত করে, ভিটামিন ই সন্তান উৎপাদনে সহায়ক।

যতদিন ভিটামিন প্রয়োজনানুসারে শরীরময় বিন্যস্ত থাকবে ততদিন বজায় থাকবে স্বাস্থ্য। এজন্য দেখা যায়, পঞ্চাশ বছর হতে না হতে মানুষ ভিটামিন-বড়ি নিয়ম করে খাচ্ছে। খাদ্য থেকে ভিটামিন সংগ্রহ করার ক্ষমতা ততদিনে শরীর প্রায়

হারিয়ে ফেলে — তাই এই কৃত্রিম ব্যবস্থা। বেশি ভিটামিন শরীর সহ্য করে না, অতিরিক্ত ভিটামিন ডি বিষতুল্য। কৃত্রিমভাবে দেহে ভিটামিন ঢুকিয়ে যৌবন ফিরে না আসুক, অন্তত হারানো কর্মক্ষমতা কিছুটা শরীর ফিরে পায়। প্রাতরাশের সময় একটা মালটিভিটামিন ট্যাবলেট গেলা আজকাল অনেক বয়স্ক মানুষের অভ্যাস।

বার্ধক্য প্রতিরোধের কথাই যদি ওঠে, তাহলে কার্যকরী ভিটামিন হিসাবে ভিটামিন ই'র নাম করতে হয়। সন্তান উৎপাদনে সহায়ক বলেই বোধহয় ভিটামিন ই কিছুটা বার্ধক্যপ্রতিরোধী। ভিটামিন ই'র মধ্যে একাধিক সমজাতীয় যৌগিক পদার্থ থাকে, যাদের মধ্যে আলফা-টোকোফেরল বার্ধক্যপ্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

জারক-বিরোধী হিসাবে ভিটামিন ই'র নাম আছে। কোষের মধ্যে প্রোটিন, শর্করা প্রভৃতির আত্তীকরণ হয়, অক্সিজেন সহযোগে এদের ও স্নেহপদার্থের "দহন", শোষণ চলে। অক্সিজেন দহনের কাজে ভূমিকা নেয়। দেখা গেছে, কোষে যত বেশি এই দহনক্রিয়া চলতে থাকে তত কোষ জীর্ণ হয়ে পড়ে। ভিটামিন ই কোষের ভিতরে অক্সিজেন সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ, শেষ বিচারে কোষের ক্ষয় কমিয়ে দেয়। ভিটামিন ই রক্তবহনকারী ধমনী-শিরাকে স্ফীত করে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাপথে রক্ত চলাচল সহজ হয়, ফলে দেহের প্রতিটি অংশ কার্যকারী হয়। বিশেষ করে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ অথবা হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তপ্রবাহের অস্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়। স্ট্রোক বা হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় অনেকটা। শুধু এসবই নয়, রক্তবহনকারী নালীগুলির দেয়ালের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে ভিটামিন ই'র গুরুত্ব অপরিসীম।

হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তবাহীনালীর স্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যাপারে ভিটামিন ই'র কার্যকারীতা অনেকদিন ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে আসছেন। এঁদের মধ্যে কানাডার দুজন বিজ্ঞানী ডবলু ই শুটে এবং ই ভি শুটে অন্যতম। ভিটামিন ই সংক্রান্ত উপরোক্ত বিচারগুলি আলোচ্য বিজ্ঞানীদ্বয় আবিষ্কার করেছেন। পরে অবশ্য সেভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাঁদের কাজকে সমর্থন করেছেন।

অনেকেই জানেন, বার্ধক্যে দীর্ঘজীবী কোষের, যেমন নিউরণ কোষ বা হৃদ্‌যন্ত্রের কোষের উপর কালচে-হলদে রঙের

একটা দাগ ধরে—এটি লিপোফুসচিন নামে এক ধরণের যৌগিক পদার্থের জন্য। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভিটামিন ই এই লিপোফুসচিনের প্রতিরোধী রাসায়নিক। লিপোফুসচিনের সঙ্গে বার্ধক্যের সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকলে অবশ্যই বলতে হবে যে ভিটামিন ই লিপোফুসচিনকে সরিয়ে বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে।

ভিটামিন প্রসঙ্গে কিছু বললে খনিজ পদার্থের কথা এসে পড়ে। ভিটামিনের মতো খনিজ পদার্থগুলিও কোন অর্থে খাদ্য নয়, এদের প্রায় কোন ক্যালোরি—মূল্য নেই। সমস্ত রকমের খাদ্যের মধ্য দিয়ে খনিজ পদার্থ দেহে আসে। এদের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ, কপার, আয়োডিন, ফ্লুরিন, জিংক, মলিবডেনাম, মাঙ্গানিজ, ভ্যানাডিয়াম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অজৈব পদার্থগুলি সরাসরি খুব কমই দেহে সঞ্চারিত হয়। জৈবপদার্থের দেহে লগ্নী হয়ে এরা সাধারণত বিচরণ করে। পরিমাণে এরা অল্পই থাকে, কিন্তু সেই অল্পই যথেষ্ট। একটুখানি অজৈব পদার্থ দেহের সামগ্রিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যার যেখানে অবস্থান, সেখানে সে না থাকলে দেহব্যবস্থায় নামে বিপুল বিপর্যয়। যেমন, লোহার অভাবে রক্তাল্পতা, আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, ফ্লুরিনের অভাবে দন্তক্ষয়, ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থিক্ষয় প্রভৃতি রোগ-ভোগ আসে।

বার্ধক্যে যেমন শরীর ভিটামিনকে খাদ্য থেকে আত্মসাৎ করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি ব্যর্থ হয় খনিজ পদার্থকে আহরণ করতে। ফলে ঝিমুনি, অবসাদ, বিস্মৃতি প্রভৃতি দেখা দেয়।

খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে ভ্যানাডিয়ামের প্রতি বার্ধক্যবিজ্ঞানীদের নজর পড়েছে। তাঁরা মনে করছেন, ভ্যানাডিয়াম কোলেস্টেরল উৎপাদনে বাধা দেয়, গলব্লাডারে পাথর জমতে দেয় না; এমনও হতে পারে, ভ্যানাডিয়াম এমন কোন এনজাইমের অংশ যা হৃদ্‌রোগ সংক্রান্ত ব্যাধির প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে।

শুধু ভ্যানাডিয়াম কেন, আরো কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যে বার্ধক্য বিরোধী তাও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। স্বাভাবিক মাত্রার থেকে তিনগুণ বেশি পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োগের ফলে কোলেস্টরলের মাত্রা কমে অত্যাধিক। কিডনিকে সচল রাখার কাজেও ম্যাগনেসিয়াম জরুরী। জিংক বা দস্তার

সরবরাহ ঠিক থাকলে অস্থি স্বাভাবিক থাকে এবং প্রোটিনের গঠনগত ভুলত্রুটি সংশোধিত হয়। পটাশিয়াম হৃদ্‌যন্ত্রের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, রক্তকোষের ভিতরকার পটাশিয়ম মাত্রা ও রক্তকোষের বহিঃস্থ প্লাজমাতে সোডিয়ামের মাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে রক্তও রক্তচাপজনিত আধিব্যাধি দূর হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, ফ্লুরিন বৃদ্ধদের জীবনে মস্ত সহায়ক। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অন্যতম শারীরিক ত্রুটীর নাম অস্থির কোমলতা, যার নাম অস্টিওপোরেসিস (osteoporasis)। ধমনীর নমনীয়তা হ্রাস বা ধমনীর কাঠিন্য—বার্ধক্যে স্বাভাবিক। এই দুই রোগের ক্ষেত্রেই ফ্লুরিন বিশেষ সহায়ক। সমীক্ষায় জানা যায়, যে সব অঞ্চলে পানীয় জলে ফ্লুরিনের যথেষ্ট অভাব আছে সেখানে মহিলাদের মধ্যে এই অস্টিওপোরেসিস খুব দেখা যায়।

এর আগে হর্মোনের বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার কাজে হর্মোন অপরিহার্য। তারুণ্যে বৃদ্ধি-হর্মোন পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে উৎসারিত হয়। এই হর্মোন শরীরের শুধু বাড় ঘটায় না, তরুণ তরতাজা হাবভাবের জন্যও দায়ী । বৃদ্ধি-হর্মোন এক বিচারে বার্ধক্য-বিরোধী।

বার্ধক্যে পিটুইটারী থেকে বৃদ্ধি-হর্মোনের নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি-হর্মোন দেহে ঢুকিয়ে দিতে পারলে কিছুটা কাজ হতে পারে। পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে খুব বেশি হলে এক আউন্সের এক-ষষ্ঠাংশ পরিমাণ বৃদ্ধি-হর্মোন বের করা যায়। ষাটের দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বৃদ্ধি-হর্মোনের গঠন সংকেত বের করেছেন, একশ অষ্টাশিটা অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে তৈরি হয়েছে বৃদ্ধি-হর্মোন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি-হর্মোন কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যাবে এবং বার্ধক্য নিবারণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সে তখন নিতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে প্যারাবায়োসিস সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে হয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে কিছু বিশেষ পরীক্ষা করা হয়েছিল—এটাই প্যারাবায়োসিস। শল্যচিকিৎসা করে একটি বৃদ্ধ ইঁদুরের লেজের সঙ্গে একটি কম-বয়েসী ইঁদুরের ধর লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যাতে একই রক্তচলাচল ব্যবস্থার মধ্যে দুটি প্রাণীর দু'টি অংশই পড়ে। আরশোলাদের নিয়েও এরকম পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল, তরুণের সংযোগে বার্ধক্য স্তিমিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, তরুণের দেহ-রক্তে এমন কিছু আছে যা বৃদ্ধের প্রাণচাঞ্চল্য বাড়িয়ে দেয়।

প্যারাবায়োসিস পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে বৃদ্ধি-হর্মোনকে কৃত্রিমভাবে শরীরে বাড়াতে পারলে বার্ধক্য কিছুটা প্রতিহত হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, ক্ষতিগ্রস্ত ডি এন এ—যে বিকৃত প্রোটিনদের উৎপাদন করে সেখানে কি কিছু করার আছে? শরীরের দায়বদ্ধ কাজ যে ক্রমেই অসমাপ্ত থেকে যায়, তার পিছনে ক্ষতিগ্রস্ত ডি এন এ'র ভূমিকা সর্বাধিক। ক্ষতিগ্রস্ত ডি এন এ—কে কি কোন ভাবে মেরামত করা যায়?

কৃত্রিম ভাইরাসকে একাজে লাগানো সম্ভব বলে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন। যে ডি এন এ-কে মেরামত করা দরকার তার একটি সঠিক আকৃতি দেওয়া হয় প্রথমত। গোটাটা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হয়। অর্থাৎ, কৃত্রিম পদ্ধতিতে বা গবেষণাগারে যে ডি এন এ — কে মেরামত করা হবে, তাকে তৈরি করা হলো। এরপর, এর গায়ে একটা প্রোটিনের চাদর জড়িয়ে দিলে তা হবে কৃত্রিম ভাইরাস। কৃত্রিম ভাইরাসকে এর পর দেহে ঢুকিয়ে দিলে তা নিজে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত ডি এন এ-কে সরিয়ে দেবে, ঠিক যেমন শত্রুরূপী ভাইরাস দেহের ডি এন এ ব্যবস্থাকে দখল করে নেয়। একবার দখল নিতে পারলে তথাকথিত কৃত্রিম ডি এন এ-ই আসল ডি এন এ হয়ে যাবে এবং শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ভূমিকা নিতে শুরু করবে।

অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা এখনও পরিকল্পনা ও গবেষণাস্তরে আছে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের জীবনে পরীক্ষাগুলি চলছে। এটা আদৌ চলবে কি চলবে না তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

দীর্ঘকাল মানুষ দুটি অধরার জন্য প্রাণপাত করেছে। এদের মধ্যে একটি— পরশপাথর। যার পরশে সামান্য সামগ্রী স্বর্ণের রূপ পায় সেই পরশপাথর পাবার জন্য মানুষ খ্যাপা হয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। অ্যালকেমিদের

শরণাপন্ন হয়েছে মানুষ—সাধারণ ধাতুকে কি কোনভাবে সোনায় রূপ দেওয়া যায় না ?

দ্বিতীয় অধরা হল— যৌবন ধরে রাখার সুধা। এর জন্যও মানুষ অ্যালকেমিদের দ্বারস্থ হয়েছে।

প্রাচীন কালের রাজা — বাদশাহ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের শিল্পপতি বিত্তশালী— সবার স্বপ্ন একই। যুগে যুগে মানুষ কত চেষ্টা করেছে। ধনকুবেররা মন্ত্রতন্ত্র, মন্ত্রপূত সুধাপান, বিশেষ বিশেষ ভেষজ সেবন, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দিনযাপন—সব কিছু করেছেন যৌবনকে চিরকালের মতো বেঁধে রাখার জন্য। এ ব্যাপারে কত কুসংস্কার ছিল এবং আছে। নিরপরাধকে তার জন্য কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

সিরিয়াতে প্রাচীন কালের রাজারা তরুণদের, বিশেষ করে তরুণী ক্রীতদাসীদের রক্তপান করতেন। এতে কি কোন কাজ হতো ? নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনিতে সুখাদ্য, বিশ্রাম ইত্যাদি রাজাদের দীর্ঘজীবন লাভে সাহায্য করতো, তার সঙ্গে তরুণী ক্রীতদাসীদের রক্তের হর্মোন তাঁদের আরো কিছু বাড়তি সাহায্য করতো কি না জানা নেই। "Elixir for Youth" সন্ধানে তাঁরা শুধু অ্যালকেমিদের সাহায্য চাইতেন না, তার জন্য অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কারের দ্বারস্থ হতে তাঁদের বাধতো না।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা elixir for youth খুঁজছেন না। যৌবন ফিরিয়ে দেওয়াটা কোন উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষের পক্ষে একশ বছর বাঁচাটা অসম্ভব নয় এবং তার দেহগত বিচার তাকে একশ বছর বাঁচবার কথাই বলছে। অথচ আশি বছরের উর্দ্ধে এখনও যে হাতে-গোণা মানুষ দেখা যায় তার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। আমরা যদি আরো কিছুটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি এবং বার্ধক্যের কারণগুলি বুঝে তার প্রতিকারের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিই তাহলে একশ বছর পর্যন্ত সুস্থভাবে বাঁচাটা একেবারেই অসম্ভব নয়।

বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদ তথা রসায়নবিজ্ঞানী ক্লড বার্নাড বলেছিলেন যে সুস্থ মানুষের দেহে একটা সাম্যাব্যস্থা বিরাজ করে। তিনি একে homeostasis বলেছিলেন। শরীরের উষ্ণতা, রক্তের অম্লতা-ক্ষারত্ব ও আয়নের সমতা, জলের নির্দিষ্টতা, বিভিন্ন হর্মোনের নিঃসরণ মাত্রা, অক্সিজেনের সরবরাহ—সব মিলে এই homeostasis গড়ে তোলে।

শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থা বা আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সাম্যের মূলে। যতই বয়স বাড়তে থাকে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে, সাম্যের অভাবে নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়।

বার্নাডের মতে, homeostasis বজায় রাখার জন্য সচেতনভাবে আমাদের কিছু করা উচিত। Elixir for youth বা আধুনিক কোন ম্যাজিক ড্রাগ নয়, নির্দিষ্ট প্রতিরোধগুলি গড়ে তুলতে পারলে জীবনকে দীর্ঘ ও সুন্দর করা সম্ভব।

এক কথায় বলতে গেলে – উন্নতমানের খাদ্য, প্রয়োজনীয় এনজাইম, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন, গ্রন্থিক্ষরণজাত হর্মোন যদি সঠিকভাবে সরবরাহ করা যায় এবং শারীরিক খণ্ডাংশের মেরামতি বা প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে দীর্ঘজীবন না পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

শারীরিক খণ্ডাংশের মেরামতি বা প্রতিস্থাপনের বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। বলতে গেলে, শরীরে এমন কোন অংশ নেই যেখানে মানুষের কারিগরি হাত পড়েনি। প্রথমেই ধরা যাক চামড়া-চুলের ব্যাপারটা।

চামড়ার উপর বয়সের ছাপ চট্ করে ধরে। কুঁচকে যাওয়া, খসখসে হওয়া চামড়া বয়সের লক্ষণ। মাথার চুল উঠে যাওয়া, অথবা চুল থাকলেও তা সাদা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। প্লাস্টিক সার্জারি, চুলের কলপের সাহায্যে এদের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। হয়তো বৃদ্ধের অমসৃণ চামড়াকে প্লাস্টিক সার্জারি করে প্রতিস্থাপন কাজটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হবে, তবে এ কাজ সম্ভব।

বার্ধক্যে শ্রবণশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, দশ বছর বয়সে মানুষের সবচেয়ে ভালো শ্রবণশক্তি থাকে–তারপর কমতে থাকে। বৃদ্ধেরা হামেশাই "হিয়ার-এড" নেন–এও তো একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা।

চোখের ক্ষমতা একটু বয়স হলেই কমতে থাকে। কৃত্রিম চোখ, অর্থাৎ চশমা ওঠে নাকের উপর। আরো বার্ধক্যে ছানি পড়লেও অসুবিধা নেই, অস্ত্রোপচারের সুযোগ সব সময় আছে। মাঝবয়সী মানুষদের যখন "চালশে" রোগে ধরে তখন বাইফোকল চশমার সাহায্য নিতে হয়। চাইকি চোখের বিনিময়ে আর একটা চোখও পাওয়া যায়!

স্বাদ ও গন্ধের বিষয়টাও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে থাকে। লক্ষ্য করা গেছে, ষাট বছরের পর থেকে খাদ্যের স্বাদ

গ্রহণের ক্ষমতা কমতে থাকে—খাবারের ভালো মন্দের দিকটাও প্রায় নজরে আসে না তখন। গন্ধ সম্পর্কে উদাসীনতাও লক্ষ্য করা যায়। স্বাদ বা গন্ধের ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনার কোন কৃত্রিম পদক্ষেপ এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রয়োজনের দিক থেকে তেমন চাহিদা নেই বলেই হয়তো এই অবস্থা!

ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি, হৃদ্‌পিণ্ড— এসবের বদলা-বদলি চলে। ডায়ালিসিস করে কিডনিকে সাহায্য করা যায়। তবে কৃত্রিম দেহাংশদের মধ্যে "পেস-মেকার" বোধহয় সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। এক-আধ বছর নয়, বছরের পর বছর বুকের মধ্যে বসানো পেস-মেকার হৃদ্‌যন্ত্রকে সাহায্য করে যায়, জীবনের আয়ু বাড়িয়ে চলে।

বার্ধক্যের যষ্ঠি সত্যিকারের সহযোগী। শরীরের ভারসাম্য যখন শরীর আর নিজে বহন করতে পারে না তখন যষ্ঠি ছাড়া আর উপায়ই বা কি! তেমন তেমন অবস্থায় হুইল-চেয়ারই চলাচলের একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এ সবই সহযোগী —"এইড"।

বার্ধক্যে অনিদ্রা স্বাভাবিক। ঘুম যত গাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় তত জীবন দীর্ঘায়িত হতে পারে। বার্ধক্যের অনিদ্রা তাই স্বাস্থ্যহানির কারণ। এ এক দুষ্টচক্র। বার্ধক্য ঘুমকে কমিয়ে আনে, ক্ষণস্থায়ী ঘুম আবার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে।

ঘুম বার্ধক্যের মহা প্রতিষেধক। ঘুম পাড়িয়ে অনেক সমস্যা সমাধান সম্ভব। নিদ্রা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে আজ অধিকতর গবেষণায় মগ্ন আছেন তার পিছনে নিছক কৌতূহল কাজ করছে না, ঘুম-চিকিৎসার সুফলগুলি কিভাবে আমাদের দ্বারস্থ করা যায়, তাও ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আছে।

ঘুমের রাসায়নিক কারণ জানতে পারলে অনিদ্রা সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্ত করার পথ মিলবে। আগামী দিনে আমাদের আরো জটীল সমাজব্যবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। তাই অনিদ্রা, হাইপারটেনসন, অ্যাগোনিম্যানিয়া ইত্যাদি প্রায়-মানসিক রোগগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। নিদ্রা গবেষণার আর একটি দিক আছে। সেটা হলো, ভবিষ্যতে মানুষকে খুশীমতো দীর্ঘসময়ের জন্য ঘুম পাড়ানো যাবে। "ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী" গানের বদলে যথার্থ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ তখন আমাদের "শীতকালীন ঘুম"

বা হাইবারনেশনে পাঠিয়ে দেবে। তাতে অনেক লাভ। রোগের প্রশমন করতে হয়তো এমন কৃত্রিম হাইবারনেশন খুবই কাজে দেবে। ঘুমপাড়ানি চিকিৎসা ডায়াবেটিস, গ্যাসট্রিক আলসার নিরাময় করেছে বলে শোনা গেছে।

বৃদ্ধের ঘুম আনানোর জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া চাই। না, কোন ট্যাবলেট নয়—নিছক লঘু ব্যায়াম, সুশৃঙ্খলজীবন ও আনন্দ শান্তিই পারে সেই কাঙ্খিত ঘুমকে ডেকে আনতে, যা দীর্ঘজীবনের সহযোগী। এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করবো বলে প্রসঙ্গের ইতি এখানেই টানছি।

বুড়োদের অসুখ-বিসুখ

বৃদ্ধের জীবনে সুখ নেই। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। আজ বদহজম তো কাল বাতের ব্যথা। এই রক্তচাপ বাড়ছে—এই কমছে। রাতে ঘুম নেই, দিনে ঝিমুনি।

বুড়োদের আসরে নানান কথাবার্তার মধ্যে আধি-ব্যাধিই প্রধান আসন করে নেয়। কোন্ ডাক্তার ভালো, কে মন্দ এসব তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে ডাক্তারী-বিদ্যার মধ্যে পড়ে না এমন সংবাদ-পরামর্শেরও বিনিময় হয়। বাতের জন্য হাইটেনশন তারের বালা কিংবা মন্ত্রপূত অষ্টধাতুর তাগা-তাবিজ যথেষ্ট সমাদর ও মর্যাদা পায়।

চিকিৎসকরা দেখেছেন—বৃদ্ধদের জীবনে তিন শ্রেণীর ব্যাধি আসর জাঁকিয়ে বসে। শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার দুর্বলতাজনিত ব্যাধি, সংক্রামক ব্যাধি এবং ক্যান্সার। এর মধ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণীটি অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধি চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। শারীরবৃত্তীয় ব্যাধি প্রথম থেকে ব্যবস্থা নিলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে ক্যান্সার সম্পর্কে কারণ না জানার জন্য ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব। অবশ্য ক্যান্সার রোগ প্রথম অবস্থায় সনাক্ত করা গেলে তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য থাকে।

হজমের গোলমাল, মূত্র বা মূত্রব্যবস্থার সমস্যা—বিশেষ করে প্রস্ট্রেট গ্লান্ডের বৃদ্ধি, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা, অন্তঃক্ষরণের উৎস গ্রন্থির দুর্বলতা, বাত, নার্ভ-দৌর্বল্য—এগুলিই সচারচর বৃদ্ধবয়সে দেখা যায়।

যে সব রোগ বার্ধক্যে বেশি দেখা যায় তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, নার্ভ সংক্রান্ত ব্যাধি, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, হৃদ্‌পিণ্ডের ব্যাধি প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যার সঙ্গে রক্ত সঞ্চালন ও রক্তের বৈশিষ্ট্যগুলি জড়িত থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের গঠনে গুরুতর ত্রুটি থাকলে তার কথা

অবশ্য আলাদা। জন্মাবধি হৃদ্‌পিণ্ডের যে ত্রুটি থাকে তাকে গঠনগত ত্রুটী বলা যায়। জন্মগত ত্রুটি নিয়েও কোন মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। হৃদ্‌পিণ্ডে সংক্রামক ব্যাধি হতে পারে—বয়সের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ হলো রক্তকে চাপ দিয়ে শরীরের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। হৃদ্‌পিণ্ড একটি পাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্তের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে যখন পরিবর্তন আসে স্বভাবতই পরিবর্তিত রক্তকে চাপ দিয়ে সরবরাহ করতে হৃদ্‌পিণ্ডকে নতুনভাবে কাজ করতে হয়—হৃদ্‌পিণ্ডের বিধিব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ে বা কমে।

একজন স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ ভারতীয়ের রক্ত-বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে দেওয়া হলো।

রক্ত-কোলেস্টরল	১৪০ — ২০০ মিগ্রা / ১০০ সিসি
রক্ত-গ্লুকোস	৭০ — ১২০ মিগ্রা / ১০০সিসি
সেরাম বিলিরুবিন	০.১ — ০.২৫ মিগ্রা / ১০০ সিসি
হিমোগ্লোবিন	
পুরুষ	১৪.৭ গ্রাম / ১০০ সিসি
নারী	১৪.৩ গ্রাম / ১০০ সিসি

রক্তচাপ	সিসটোলিক	ডায়াস্টলিক
৪০ বছর	১২৭	৮৬
৫০ বছর	১৩৩	৯০
৬০ বছর	১৪৩	৯৪
৬৫ বছর	১৪৮	৯৬

মধ্য বয়স পার হতে না হতেই রক্তচাপ বাড়া ও রক্তবাহী শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যাবার জন্য হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পঁয়তাল্লিশ বছরের উর্ধে পুরুষ জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করনারী হৃদ্‌-ব্যাধির শিকার হতে দেখা যায়। নারীরা অপেক্ষকৃত কম হারে আক্রান্ত হন, প্রতি ছ'জন পুরুষ পিছু একজন নারী রক্তচাপজনিত হৃদ্‌পিণ্ডের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

তুলনামূলকভাবে তরুণ ও বৃদ্ধদের তুলনায় মধ্যবয়স্করা, স্ফীতকায় ব্যক্তিরা, উচ্চরক্তচাপ আছে এমন মানুষেরা, ডায়াবেটিস ও গলব্লাডারজনিত ব্যাধির শিকার যে মানুষেরা,

তাদের মধ্যে করনারী হৃদ্-ব্যাধি বেশি দেখা যায়। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল মানুষেরা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে এই রোগে আক্রান্ত হন।

হৃদ্‌পিণ্ডের পেশীতে করনারী ধমনী রক্ত সরবরাহ করে। হৃদ্‌পিণ্ডকে রক্তসঞ্চালনের কাজ করতে হলে, অর্থাৎ রক্তকে পাম্প করে চারদিকে পাঠাতে হলে শক্তির প্রয়োজন হয়—করনারী ধমনীর রক্ত এই শক্তি নিয়ে আসে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সাধারণত মোটা হতে থাকে, তাদের রক্তের চাপ বাড়ে, রক্তে কোলেস্টরল বাড়ে, ডায়াবেটিস,গলব্লাডারের রোগ দেখা দেয়— হৃদ্‌পিণ্ডের ও মস্তিষ্কের নানা অংশে রক্তসরবরাহকারী নালী-উপনালীরা স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে কঠিন হতে থাকে। নালীর ভিতরে কোলস্টরলের পলি জমে। রক্ত চলাচলকারী নালীর এই পরিবর্তনকে আর্টারিওসক্লিরোসিস বলে।

আর্টারিওসক্লিরোসিসের ফলে নালী কম হারে রক্ত পরিবহন করে। যখনই কোন কারণে হৃদ্‌পিন্ডের বেশি রক্তের প্রয়োজন হয় – সে রক্ত আর আসে না। ফলে হৃদ্‌পিণ্ড অকেজো হয়ে পড়ে—আমরা বলি 'হার্ট ফেলিয়োর'। উচ্চরক্তচাপে মস্তিষ্কের শিরাপথে রক্ত চালাচালি হতে গিয়ে শিরা ছিঁড়ে যায়— মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হতে থাকে— তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অথবা প্যারালিসিস ঘটে।

রক্তচাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধিতে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়।

ক) অল্প পরিশ্রম, যেমন সিঁড়িঁ ভাঙ্গার পর ছোট ছোট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেখা দেয়।

খ) বুকে যন্ত্রণা, চাপ অনুভব করা। যন্ত্রণাটা বাঁ হাত ধরে, কণ্ঠায় এবং চোয়ালে ছড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমের পরেই সাধারণত যন্ত্রণা দেখা দেয়।

গ) পা ফোলে।

ঘ) মাথা ধরে, বুক ধরফড়ানি দেখা দেয়, ক্লান্ত লাগে, ঘাম দেখা দেয়।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা আছে তাদের উপরোক্ত উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত।

রক্তচাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে

নিম্নলিখিত পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে ।

ক) চল্লিশ বছরের পরে এবং যাদের পরিবারে রক্তচাপজনিত ও হৃদ্‌যন্ত্রঘটিত ব্যাধির ইতিহাস আছে—তাদের নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

খ) যাদের ধূমপানের অভ্যাস আছে, ডায়াবেটিস আছে দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছেন তাঁদের বয়স চল্লিশ ছাড়ালে নিয়মিত চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া দরকার ।

গ) হৃদ্‌পিণ্ডের ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

ঘ) মাঝারি আহার করা, কম স্নেহ পদার্থকে খাদ্যে নেওয়া দেহের ওজন স্থির রাখা উচিত ।

ঙ) ধূমপান, অতিরিক্ত আহার, মদ্যপান পরিহার করা উচিত ।

চ) নিয়মিত লঘু ব্যায়াম করা চাই ।

ছ) নিয়ম করে বিশ্রাম করা চাই । মানসিক অস্থিরতা ও চাপ পরিহার করতে হবে ।

রক্তসরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে হৃদ্‌যন্ত্র হঠাৎ বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া নতুন কিছু নয় । আগে এই মৃত্যুকে "সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু" বলা হতো । গত শতকেও "সন্ন্যাস রোগ" সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না । এই শতাব্দীর গোড়া থেকে যখন পশ্চিমী দেশগুলিতে ব্যাপক শিল্পায়ন শুরু হয়, মানুষের জীবনে দ্রুততা বৃদ্ধি পায়, মানসিক চাপ, অস্থিরতা এবং উচ্চাশা বাড়ে তখন থেকে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে । এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রও এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী রূপ পেতে থাকে । বিশ শতকে দেখা দিল নতুন চিকিৎসাবিজ্ঞান—"কার্ডিওলজি" ।

কার্ডিওলজি যত বিকশিত হতে থাকে হৃদ্‌পিণ্ড সম্পর্কে পুরানো ধারণাগুলি বাতিল হতে থাকে এবং নতুন নতুন ধারণা তৈরি হতে থাকে । অগ্রগামী ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় — উচ্চ রক্তচাপ কমাবার নতুন নতুন ওষুধ, হৃদ্‌পিণ্ডে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য অ্যান্টিবায়োটিক, করোনারী থ্রম্বোসিসের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট জাতীয় ঔষধপত্র ।

আধুনিক শল্য চিকিৎসাও এ ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে । হৃদ্‌পিণ্ডের গঠনমূলক অস্বাচ্ছন্দ্য, রিউমাটিক হৃদ্‌পিণ্ড

প্রভৃতিতে নানা প্রকৃতির শল্য চিকিৎসা আজকাল চলছে। এর পাশাপাশি মধ্যবয়সী মানুষ, যাঁরা হৃদ্‌রোগের শিকার হয়ে আংশিক অক্ষম হয়েছেন, তাঁদের জন্য পেশাগত–জীবিকাগত পুনর্বাসন দেওয়ার কাজও চলছে পূর্ণ গতিতে।

সত্যি কথা বলতে কি, হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধদের থেকে মধ্যবয়সীদের বেশি। সে অর্থে এটা ঠিক বার্ধক্যের রোগ নয়। তবে মধ্য বয়স পার হয়ে যারা বার্ধক্যে আসছেন তাদের অনেকই কম-বেশি দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাছাড়া উচ্চ রক্তচাপের ব্যাপারটা তো আছেই। যত বয়স বাড়ে রক্তচাপ বাড়ার ঝোঁক থাকেই। আর উচ্চরক্তচাপ সঙ্গে করে আনে হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা।

এছাড়া দু-একবার মৃদু হৃদ্‌পিণ্ড-লহড়ী ওঠার পরও শরীর অনেকসময় টিঁকে থাকে। মাইল্ড স্ট্রোক পার হওয়া বুড়ো-বুড়িদের সংখ্যা নেহাত কম হবে না। সত্তর-উর্ধ্ব ব্যক্তিদের অনেকেই মাইল্ড স্ট্রোকের শিকার, যেন অপেক্ষা করে আছেন সেই চূড়ান্ত ও অমোঘ আঘাতের জন্য। বাইপাস সার্জারী থেকে শুরু করে পেস-মেকার বসানো, মায় কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র সংস্থাপন – সবই তো চলছে আজকাল। হৃদয়ের ধুকপুকানিটুকু যতদিন থাকে ততদিনই তো জীবন। ওটা যেদিন থামলো – সবই গেল। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা সবাই কম-বেশি স্বাস্থ্য, অসুখ-বিসুখ বুঝি। তাই বুকে একটু যন্ত্রণা হলো কি না হলো–আমরা তোলপাড় করে ফেলি চারদিক। একদিক থেকে ভালো – তবু প্রশ্ন থেকে যায় – অতিসচেতনতা কি সত্যই সচেতনতা ?

মানবশরীরে নানান রাসায়নিক বিক্রিয়া নানান উদ্দেশ্যে চলছে। দেহের বৃদ্ধি, সচলতা, পুষ্টি বজায় রাখার কাজে জীবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ক্রিয়াশীল। এরা যেমন দেহের প্রয়োজন মেটায় তেমনি অনেক অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে। অপ্রয়োজনীয় বর্জ পদার্থগুলিকে দেহ বিভিন্ন উপায়ে শরীরের বাইরে বের করে দেয়। মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, ঘাম ফেলা– এসবই সেই সাধারণ উপায়।

বয়স যত বাড়তে থাকে বর্জ পদার্থ পরিত্যাগের ব্যাপারটা তত জটীল হতে থাকে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের ক্ষেত্রে জটীলতা কখনও কখনও অন্য রাস্তা ধরে। সাধারণ অস্বস্তি, ক্ষুধামান্দ্য তো থাকেই, তার সঙ্গে অম্বল, বদহজম যোগ

দেয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রাবল্য মলদ্বারের নিচের অংশে যথেষ্ট অত্যাচার করে রেক্টাম ক্যান্সারের সূত্রপাত করে।

খাদ্যের অসার কঠিন অংশ মলরূপে বেরিয়ে যায়। কিন্তু দেহের নানান রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্জ সামগ্রী— যা রক্তের মধ্য দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়, তারা প্রধানত মূত্র মারফৎ শরীরের বাইরে আসে। মূত্রের মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার অবশেষ থাকে—এরা সকলেই পরিত্যজ্য। রোগ বিশেষে আরো কিছু মূত্রের মধ্যে থেকে যায়। মূত্রে কখনও কখনও আমরা রক্ত,পুঁজ, পাথরকণা, ব্যাকটেরিয়া, অ্যালবুমেন পাই।

মূত্রাশয়, কিডনির সাধারণ ব্যাধিগুলি বৃদ্ধ বয়সে দেখা যায়, তবে কিডনির পাথর ও প্রস্ট্রেট গ্লান্ডের বৃদ্ধি— এই দুটি বার্ধক্যে বেশি আসে।

কিডনিতে পাথর জমলে প্রথম প্রথম টের পাওয়া যায় না, তবে কলিক যন্ত্রণার মতো যন্ত্রণা কোমরের পিছনের একটু নিচে থেকে শুরু করে দাবনা অবধি ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। মূত্র পরীক্ষা করে এবং কিডনির এক্স-রে করে ব্যাধিকে সনাক্ত করা হয়। কখনও কখনও কিডনির পাথর ক্ষুদ্র আকারের হলে তা মূত্রভাণ্ডারে নেমে এসে জমা হয় এবং মূত্রের তোড়ে বেরিয়েও যায়। সাময়িকভাবে আরাম বোধ করলেও ব্যাধির সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। কিডনির পাথর মূত্রভাণ্ডারেও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য তো অবশ্য দরকার। তাছাড়া কিডনিতে পাথর জমলে রোগীকে খাদ্য সম্পর্কে সতর্ক হতে হয়। কি ধরনের পাথর হয়েছে এবং রোগের বৃদ্ধি কতটা তার উপর খাদ্য নির্ভর করবে। অক্সালেট ধরনের পাথর হলে রোগীকে টম্যাটো, আদা, পেঁয়াজ, হলুদ, ঢ্যাঁড়শ, স্যালাড, গম প্রভৃতিকে খাদ্য থেকে বাদ দিতে হবে। ইউরিক অ্যাসিডের পাথর হলে চা, কফি, মাংস, মেটে, বাদাম বাদ দিতে হবে। যাই হোক না কেন, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে।

বৃদ্ধের জীবনে আর একটি মূত্রজনিত ব্যাধি প্রবল আকারে দেখা দেয়—প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ডের স্ফীতি। যদিও প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ড সঠিক অর্থে মূত্র-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলেও এই গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি মূত্রব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটায়। সাধারণভাবে ষাট বছরের উর্ধের পুরুষদের মধ্যে এই ব্যাধি দেখা দেয়। প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ডের ক্যান্সারও হয়। স্ফীতকায় গ্ল্যান্ড মূত্রভাণ্ডার থেকে আগত

নালীকে চেপে ধরে এবং সে কারণে মূত্রত্যাগের সময় প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়, অনিয়মিত মূত্রত্যাগ হয়। ব্যাধি তীব্রতর হলে মূত্রত্যাগ বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

ওষুধপত্রে প্রথম-প্রথম কিছুটা কমলেও স্ফীতকায় প্রস্ট্রেট গ্ল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। সে অবস্থায় অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

কিডনিকে সবল সতেজ রাখার অন্যতম উপায় হলো — প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা। প্রমাণ আকারের গেলাসের অন্তত সাত-আট গেলাস জল একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন পান করা উচিত। তাছাড়া গরমের সময় ডাবের জল, হালকা সরবত গ্রহণ করলে ভালো হয়। জল সরবরাহ করতে ফল খাওয়া যায়। ভিটামিন ও খনিজ লবণের সঙ্গে সঙ্গে ফল মূত্রব্যবস্থাকে সবল রাখে। মূত্র বা মূত্রজনিত যে কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনে বাত প্রায় স্থায়ী সঙ্গী। শীতে বা বর্ষায়, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় তো কথাই নেই, অন্য সময়েও বাতের যন্ত্রণায় তারা প্রায় শয্যাশায়ী না হলেও যথেষ্ট কাবু। কোমরে, হাতে, পায়ে, সর্বত্র বাত হতে পারে।

রিউমাটয়েড আর্থাইটিস অস্থিসন্ধিস্থলে, চামড়ায়, পেশীতে, এমনকি হৃদ্‌যন্ত্রে হতে পারে। ঠিক কি কারণে এ রোগ হয় তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে দেখা গেছে যে বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে এই রোগ বৃদ্ধদের থেকে প্রায় তিনগুণ পরিমাণে বেশি হয়। এর জন্য শারীরবৃত্তীয় ঝোঁক কতটা দায়ী আর জীবনযাপনের পদ্ধতি কতটা দায়ী তার হিসাব হয়নি।

যন্ত্রণা, কাঠিন্য এবং বিকৃতি হলো এ রোগের প্রধান প্রধান অভিব্যক্তি। তরুণ রোগে যন্ত্রণাই প্রধান লক্ষণ, রোগ বাড়লে হাতের বা পায়ের আঙুল বেঁকে পর্যন্ত যেতে পারে—চলচ্ছক্তিহীন প্রায় পঙ্গু হয়ে যেতে হয় রোগীকে।

আক্রান্ত দেহাংশর বিশ্রাম প্রয়োজন। ম্যাসেজ, সেঁকে কিছুটা উপকার হয়। কখনও কখনও দেহাংশের বিকৃতি দূর করার জন্য শল্য চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়।

ক্যালসিয়ামের অভাবে এবং হাড়ের কমনীয়তার জন্য অস্টিওমালাসিয়া ব্যাধি দেখা দেয়—বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য, ভিটামিন ডি দেওয়া হয় এদের।

বয়স যত বাড়তে থাকে পিঠের ব্যথা, ফিক—ব্যথাও বাড়তে থাকে। মানুষ খাড়াভাবে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মূল্য হিসাবে এই পিঠের ব্যথাকে অর্জন করে। গঠনগত কারণে পিঠ-ব্যথার জন্ম হলেও এটাই সবসময় একমাত্র কারণ নয়। সাধারণ দুর্বলতা, ভুল ভঙ্গিমায় শয়ন-উপবেশন, আঘাত, লাম্বাগো, বাত, যক্ষা ও মেরুদণ্ডের ব্যাধির জন্যও পিঠ-ব্যথা হয়।

কারণ ও উৎসের উপর চিকিৎসা নির্ভর করে। ভারী কিছু তুলতে গিয়ে কোমরে বা পিঠে চোট্ লাগলে শক্ত বিছানার উপর বিশ্রাম নেওয়া দরকার। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দু-একটা ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। ব্যথা কমাবার ওষুধ সাময়িক আরাম দিলেও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকার হিসাবে তাকে অনুমোদন করা যায় না। যাদের কোমরে বা পিঠে এ ধরনের ব্যথার ইতিহাস আছে তাদের শিরদাঁড়া বাঁকানো, ঝোঁকা, ওজন তোলার কাজ সাবধানে করতে হয়। শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে ওজন তোলা, জলভর্তি বালতি তোলা, ভারী ভেজা কাপড় নিঙরানো না করাই উচিত। বসে বসে কাজটা করে তারপর সটান দাঁড়ানো উচিত—কারণ এতে শিরদাঁড়াকে বাঁকাতে হয় না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কিছু হালকা ব্যায়াম এই শ্রেণীর রোগীরা করতে পারেন। এ সব সত্ত্বেও যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে শল্য চিকিৎসকের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শল্যচিকিৎসা করা যেতে পারে।

অস্টিওআর্থাইটিস হলো বৃদ্ধ মানুষের নিজস্ব ব্যাধি। বার্ধক্যে সন্ধিস্থলের ক্ষয়জনিত কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। যে কোন অস্থিসন্ধিস্থলে, তবে হাঁটুতে এ ব্যথা সাংঘাতিকভাবে দেখা দেয়। এ ছাড়া শিরদাঁড়া, পশ্চাদ দেশ, আঙুলের সন্ধিস্থলে অস্টিওআর্থাইটিস প্রকাশিত হয়।

যন্ত্রণাই এসবের প্রধান লক্ষণ। বিশেষ করে বিশ্রামের পর, ঘুমের পর, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার পর শরীর সচল হতে গেলেই প্রথমে অস্টিওআর্থাইটিসের ব্যথাকে টের পাওয়া যায়। চলাচল করতে করতে ব্যথা কিছুটা কমে, তবে

সন্ধিস্থলের নমনীয়তা আর ফিরে পাওয়া যায় না।

বয়সকালীন রোগ হওয়ার দরুণ এর কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে রোগের তীব্রতা হ্রাস করা সম্ভব, সন্ধিস্থলকে সচল রাখা যায়। অস্টিওআর্থাইটিস সাধারণভাবে মোটা চর্বিযুক্ত ও ভারী মানুষের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে এদের ওজন কমানো দরকার। তাছাড়া, আক্রান্ত সন্ধিস্থলগুলি যেন বেশি চাপের বা কাজের মধ্যে না পড়ে তা দেখা দরকার। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপী করানো যেতে পারে।

বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা-বেদনা বাড়তেই থাকে। ঘাড় থেকে যন্ত্রণা কাঁধ বেয়ে দুই হাতে ছড়িয়ে পড়ে কখনও—এর নাম সারভাইকাল স্পন্ডলিসিস। ঘাড়ের নমনীয়তা ভালোরকম হ্রাস পায় এতে, ফলে ঘাড় ঘোরানো, নামানো বেশ যন্ত্রণাদায়ক হয়। ট্রাকশন, সারভাইকাল কলার ব্যবহার করলে আরাম পাওয়া যায়।

বাত প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস আলোচনায় আসা উচিত বার্ধক্যে হাড় খুবই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কাজে কাজেই, এই বয়সে হাড় ভাঙলে নানান সমস্যা তৈরি হয়, চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা থাকলেও জীবনযাপন দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চলা ফেরা ঘোরাঘুরি সাবধানে করা উচিত।

বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের প্রয়োজন। সুষম খাদ্য সময় মতো আহার করতে হয়, তাতে যেমন পুষ্টি হয় তেমনি হজমের গোটা ব্যবস্থা সবল সুস্থ থাকে। যৌবনে খাদ্য নিয়ে নানা অবিচার অত্যাচার করলেও শরীর তা মোটামুটি সহ্য করতে পারে, কিন্তু সেই অত্যাচার বেশি বয়সে হলে শরীর ভাঙতে বাধ্য। তাই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনে খাদ্যবিচার ও খাদ্যাভ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য সম্পর্কে চোদ্দটি উপদেশ সারা জীবন মনে রাখলে ভালো হয়। বৃদ্ধদের জীবনে এটা অবশ্য পালনীয়।

এক) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সব্জি ও ফল থাকা দরকার। এগুলি খনিজ পদার্থ, ভিটামিন সরবরাহ করে এবং মল সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

দুই) মশলাযুক্ত খাবার ও ভাজাভুজি ত্যাগ করা

উচিত।

তিন) খাদ্যকে ধুলো বালি, মশা মাছির হাত থেকে বাঁচান।

চার) সব সময় হাত মুখ সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়ে খেতে বসা উচিত।

পাঁচ) টাটকা ও উষ্ণ খাবার খান।

ছয়) পেট বোঝাই করে অতিরিক্ত খাবার খাবেন না। পাকস্থলীতে তরল ও বায়ু চলাচলের জন্য জায়গা রাখুন।

সাত) প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খান। এটা অত্যন্ত জরুরী

আট) খাবার সময় দেখবেন, খাদ্যে যেন যথেষ্ট জল ও অন্য তরল থাকে। এতে হজমের সুবিধা হবে, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হবে না।

নয়) খাবার সময় উত্তেজিত, বিষাদগ্রস্ত হবেন না। এতে হজমের গোলমাল হয়।

দশ) খাবার পর জোরে হাঁটবেন না, ব্যায়াম করবেন না। কিছুক্ষণ শুয়ে নিয়ে আস্তে পদচারণা করা যেতে পারে।

এগারো) প্রতিদিন মৃদু ব্যায়াম করা উচিত।

বারো) প্রতিদিন সময় মতো মল মূত্র ত্যাগ করা উচিত।

তেরো) ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা চাই।

চোদ্দ) হজমী ওষুধ, জোলাপ নেবেন না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রধান অভিযোগ হজমকে নিয়ে। বেশি বয়সে হজমের গোলমাল তো হবেই, কারণ প্রয়োজনীয় উৎসেচক হজমীর অভাব দেখা দেয় তখন। কাজে কাজেই সহজপাচ্য খাবার সময়মতো খেতে হবে। উন্নত প্রকৃতির প্রোটিন, অর্থাৎ মাংস ডিমকে পরিহার করাই ভালো, তবে ছোট সহজপাচ্য মাছ নিয়মিত খাওয়া যায়। রাত করে খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। রাত ন'টার মধ্যে খেয়ে দশটার মধ্যে শয্যায় গেলে হজমের উৎপাত হবে না বলেই মনে হয়।

সকাল-বিকেল হাঁটা, মৃদু ব্যায়াম, বাগান করা প্রভৃতি লঘু পরিশ্রম দেহে ও মনে স্ফূর্তি আনে—হজমের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। প্রচুর জলপান মলমূত্র ত্যাগে সুবিধা আনবে—মূত্র সংক্রান্ত ব্যাধির হাত থেকে বাঁচাবে। তেল ঘি মশলার খাবার বা ভাজাভুজি একেবারেই চলবে না—ফল খাওয়া বাড়াতে হবে।

রাতের দিকে হাল্কা খাবার নিতে হবে, চাই কি মাঝে মধ্যে এক বেলা উপোস দিতে হবে।

পেট সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাধিই বৃদ্ধ বয়সে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, পেটে যন্ত্রণা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট খারাপ; পেটে গ্যাস, জন্ডিস, বমি—সব কিছুতেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আক্রান্ত হতে পারেন। এদের যা যা ওষুধ ও বিধির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তা সবই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে খাদ্যসংক্রান্ত কোন ব্যাধি বিপর্যয় ঘটাতে পারে, তাই গোলমাল ঘটবার আগেই সাবধান হওয়া উচিত। উপরোক্ত চোদ্দটি বিধান মানলে শরীর সুস্থ না থাকার কোন কারণ নেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি ব্যাধি মানুষকে সাধারণত আক্রমণ করে তাদের মধ্যে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস অন্যতম। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এবং ব্যক্তির বয়স ও আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুমূত্র এগিয়ে আসে। বহুমূত্র এবং তার সঙ্গে রক্তের উচ্চচাপ, উচ্চ কোলেস্টরল মাত্রা হৃদ্‌যন্ত্রের বিকল হওয়ার কারণ হয় হামেশাই।

বহুমূত্র ব্যাধির লক্ষণগুলি অনেকেই জানেন। প্রচার মাধ্যমগুলির কল্যাণে চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিরা নিজেরাই মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দেন, ভাত আলুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করেন। বহুমূত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত মানষ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। খিদে পাবে, প্রচুর খাবার খাবেও—কিন্তু তা পুষ্টিতে লাগবে না, ঘন ঘন পিপাসা পাবে—জল খাবে, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করবে। রোগ যখন বেড়ে যাবে তখন প্রস্রাবে গ্লুকোস পাওয়া যাবে। বহুমূত্রের রোগীর ওজন কমতে থাকবে।

মূলত এই ব্যাধি শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতির। প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে আসা ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় শর্করা জাতীয় খাদ্যকে আত্তীকরণের জন্য। মিষ্টি, শ্বেতসার প্রভৃতি যখন খাদ্য হয়ে রক্তে আসে তখন এই ইনসুলিন তাকে প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। ইনসুলিনের ঘাটতি হলে রক্তে গ্লুকোসের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্যানক্রিয়াসের ইনসুলিন ক্ষরণ করার অক্ষমতা থেকে যে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়—তাই ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে কোন অসুবিধা নেই—

দীর্ঘকাল সুস্থ থাকা নিশ্চয় সম্ভব। তবে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। নিয়ন্ত্রণবিহীন ডায়াবেটিস নানা জটীলতা নিয়ে আসে এবং এই জটীলতাগুলি শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, এমনকি অন্ধত্ব, অন্যতম। তাছাড়া নার্ভসংক্রান্ত সমস্যা, কিডনির অবক্ষয়, হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা ও হাইপারটেনশন, ক্ষত নিরাময় না হওয়া প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডায়াবেটিস যত না ওষুধে নিয়ন্ত্রিত হয়, তার থেকে বেশি নিয়ন্ত্রিত হয় জীবনযাপনের পদ্ধতির দ্বারা। এদের মধ্যে খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মিষ্টি, শ্বেতসার অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। রোগী স্থূলকায় হলে অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ত্যাগ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে প্রতিদিন কিছু না কিছু ব্যায়াম করতে হবে। এছাড়া চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে ইনসুলিন বা অন্য ঔষধ গ্রহণ করতে হবে।

তবে নির্বাচিত ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ডায়াবেটিস অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—

"Eat, but not to satiety. Leave the table with a little hunger and live longer and healthier. Learn to art of saying "no" to a second helping and you have won half the battle against diabetes"

সর্দি-কাশি-হাঁপানী, এই ত্র্যহস্পর্শের দৌলতে বৃদ্ধের জীবন জেরবার হয়ে যায়। বর্ষার ছোঁয়া লাগলো কি না লাগলো, শীতের বাতাস বইলো কি না বইলো, বুড়ো মানুষেরা গরম জলে স্নান শুরু করলেন মোজা মাফলার বের করে ফেললেন। একদিন যে বর্ষা-শীতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে উপভোগ করা গেছে আজ তাই নানা আধি-ব্যাধির উৎস। বাত-বেদনা তো আছেই, সঙ্গে আছে ঠাণ্ডার নানা জ্বালাযন্ত্রণা।

কাশি, কফ, জ্বর, জ্বালা, শ্বাসকষ্ট—সব রকমের উপসর্গ একে একে দেখা দেবে। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হওয়ার ফলে এরা আসে। সাধারণত ঠাণ্ডা লাগা, ফ্যারেঞ্জাইটিস, ল্যারেঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, নিমুনিয়া,

ব্রঙ্কোনিমুনিয়া, প্লুরিসি, অ্যাজমা— হাজারটা ব্যাধি জড়িয়ে আছে শ্বাস-প্রশ্বাসকে কেন্দ্র করে— বুড়ো মানুষরা এদের প্রত্যেকের শিকার।

গলার নিচের অংশে অর্থাৎ ফ্যারিঙ্কসের প্রদাহ, শুকনোভাব দিয়ে ফ্যারেঞ্জাইটিস রোগের শুরু। সঙ্গে হালকা জ্বর, গলা দিয়ে খাদ্য প্রবেশ করানোর অসুবিধা, কাশি, গলাভাঙ্গা ইত্যাদি দেখা যায়। ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য এ রোগ আসে। রোগের শুরুতে বিশ্রাম, গার্গল, থ্রোট পেন্ট লাগানো চলে। তবে রোগের বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হবে। বুড়োদের ফ্যারেঞ্জাইটিস হলে বেশ ভুগিয়ে ছাড়ে। তাই রোগের থেকে প্রতিরোধের দিকটায় নজর দেওয়া বেশি দরকার। ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে বাঁচবার সর্বতো চেষ্টা করা উচিত। স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলের প্রদাহ এবং ভাইরাস সংক্রমণকে ল্যারিঞ্জাইটিস বলে। চিকিৎসা পদ্ধতি ও সতর্কতার বিষয়টা ফ্যারেঞ্জাইটিসের মতো।

ব্রঙ্কাইটিস ব্যাধিটা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। সাধারণত ঠাণ্ডা লাগা থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। ব্রঙ্কাইটিস যখন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে —ঠাণ্ডায় মাথা ধরে যায়, বুকে যন্ত্রণা দেখা দেয়, কাশি ও সঙ্গে কফ বেরিয়ে আসে। কখনও জ্বর দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। অসুখের বাড়াবাড়ি হলে তা ব্রঙ্কো-নিমুনিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

বিশ্রাম, আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরে থাকা, ঠাণ্ডা না লাগা এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মতো ওষুধ খাওয়া—এটাই সেরে ওঠার একমাত্র পথ।

বয়স্ক মানুষদের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগলে নিমুনিয়া ধরে যেতে পারে। কাজেই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে, ফুসফুসে ভাইরাস ধরে গিয়ে এ রোগ হঠাৎ আসে। প্রথমে বুকে চাপ অনুভব করা, তারপর ধুম জ্বর, নাড়ি দ্রুত বেগে চলতে থাকে, সঙ্গে কাশি। রোগের বিস্তার ঘটার আগেই উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে আসা উচিত।

যাঁরা সর্দিকাশি ফুসফুসের ব্যাধিতে ভোগেন তাঁরা অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে হাঁপানীর শিকার হন। বর্ষা ও শীতের সময় এ রোগের বাড়াবাড়ি হয়, রাতে ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটায়।

যে অবস্থায়, অর্থাৎ অনেক সময় বসা অবস্থায় রোগী সুস্থ

বোধ করলে তাকে সেই অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। ডাক্তার আনা প্রয়োজন। ঘরের দরজা-জানালা উন্মুক্ত রাখা চাই, রোগীর জামাকাপড় ঢিলা দিতে হবে।

কোন কোন দ্রব্যের প্রভাবে অ্যাজমা বাড়ে। অ্যালার্জি হয় এমন দ্রব্য যেন রোগী কখনও ব্যবহার না করে তা দেখতে হবে। আর্দ্র আবহাওয়া এ রোগের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই শুকনো আবহাওয়া আছে এমন অঞ্চলে রোগীর বাস করা উচিত। কখনও কখনও শারীরিক গঠনগত ত্রুটির জন্য অ্যাজমা হয়—পারলে শল্য চিকিৎসার দ্বারা এই ত্রুটিকে দূর করা উচিত। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিভাগের উপরিভাগের সংক্রমণের জন্য কখনও অ্যাজমা দেখা দেয়। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই ভয় বেশি। সুতরাং চট্ করে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তা বৃদ্ধদের দেখা উচিত। নচেৎ সাধারণ শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ অ্যাজমায় রূপ নিয়ে নিতে পারে। হজমের গোলমাল, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম প্রভৃতিকে পরিহার করতে হবে। অ্যাজমার কিছুটা মানসিক অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আবেগপ্রবণতা, দুশ্চিন্তা হামেশা রোগের বৃদ্ধি ঘটায়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ব্যাধি প্রসঙ্গে আমরা সবার শেষে ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করবো। এক সময় বলা হতো— ক্যান্সার বয়স্ক মানুষদের ব্যাধি।যদিও নানা কারণে এখন কম বয়সীদের মধ্যে ক্যান্সার দেখা যাচ্ছে, তবু পরিসংখ্যান বলে যে বয়স্ক মানুষদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ক্যান্সার বেশি।

অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের নাম ক্যান্সার। জীবনের স্বাভাবিক দাবীতে কোষকে বিভাজিত হতে হয়। যতক্ষণ কোষ বিভাজনের নিয়ম মেনে এবং শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী হয় ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ক্যান্সার কোষ একধরনের ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় থাকে। কোষের বিভাজনের মূলমন্ত্র সে যেন ভুলে গেছে। ডি এন এ থেকে যে গোপন বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের কোষে আসে তা যেন হারিয়ে গেছে। তাই অপ্রয়োজনীয় অসংখ্যকোষ গড়তে থাকে—এরাই দেহের শক্তিসামর্থকে দখল করে নেয়— দরকারী কাজকর্মকে শেষে দেহকে মুলতুবী রাখতে হয়— আসে ব্যাপক বিপর্যয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ক্যান্সার নবীন অবস্থায় থাকলে তা

চিকিৎসায় নিরাময় সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নবীন ক্যান্সার চেনা কি সম্ভব ? দেহের বর্হিভাগে, যেমন চামড়ায়, মুখের ভিতরে ক্যান্সার হলে তা হয়তো প্রথমেই ধরা যায়, কিন্তু লিভারে, পাকস্থলীতে, প্রস্ট্রেটে, বৃহৎ অন্ত্রে, ফুসফুসে, হাড়ে, রক্তে ক্যান্সার হলে তা সব সময় ধরা যায় না। আরো একটা অসুবিধা আছে। নবীন ক্যান্সার রোগ প্রায়শই যন্ত্রনাবিহীন, চুপিসারে সে নিজেকে বিকশিত করে। একমাত্র রোগ যখন অনেকটা বেড়ে যায় তখনই রোগী সচেতন হয়, ডাক্তার-বৈদ্যর কাছে দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু সেটা প্রায়শই শেষ অবস্থা, চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ থাকে না।

ক্যান্সারের চিকিৎসার আর একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। নানা ধরণের রশ্মি ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তারা সুস্থ কোষকেও ধ্বংস করে।

ক্যান্সার সংক্রামক রোগ নয়। সেদিক থেকে আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজের সরাসরি ক্ষতি করে না।

আমাদের দেশে মুখগহ্বর, স্বরযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার, প্রস্ট্রেট, স্তন, জরায়ু , পাকস্থলী, বৃহৎ অন্ত্র, রক্ত, অস্থিতে সাধারণত ক্যান্সার বেশি দেখা যায়। প্রথমে মনে রাখতে হবে, যে কোন বৃদ্ধি বা টিউমার ক্যান্সার নয়। যাঁরা অতিরিক্ত সচেতন তাঁরা বিন্দুতে সিন্ধু দেখেন। ঠাণ্ডা গরমে গলা ভাঙলো, কি একটু বদহজম হলো, কিছুটা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দিল— তাঁরা ক্যান্সারের কথা ভাবতে লাগলেন ! তবে এসব লক্ষণগুলি যদি কিছুটা স্থায়ী প্রকৃতির হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

আমাদের দেশে যে সব ক্যান্সার বেশি হয় তাদের কতগুলি পূর্বলক্ষণ আছে। রোগী সেই পূর্বলক্ষণগুলি দেখে প্রথমেই সাবধান হতে পারে। যেমন—জরায়ুর ক্যান্সার—ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পর যদি হঠাৎ রক্তপাত শুরু হয়, স্তন ক্যান্সার—স্তনে শক্ত কিছু অনুভব করা বা স্তনের ভিতরে কোথাও ডেলা পাকিয়ে গেছে এটা যদি হাতে অনুভব করা যায়, স্বরযন্ত্রে ক্যান্সার—হঠাৎ যদি গলা ভাঙ্গে এবং তা যদি না সারে, বৃহৎ অন্ত্রে ক্যান্সার—মলত্যাগের স্বাভাবিক প্রকৃতি যদি হঠাৎ বদলে যায়, গলদেশে এবং পাকস্থলীতে ক্যান্সার—খাদ্য গিলতে যদি কষ্ট হয় এবং হজম-ব্যবস্থায় যদি আকস্মিক গোলমাল দেখা দেয়, ক্ষত থেকে ক্যান্সার—কোন ক্ষত যদি সারতে না চায় বা

আঁচিল বা তিল যদি হঠাৎ বাড়তে শুরু করে—তাহলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসকের অধীনে যাওয়া উচিত।

কতগুলি অভ্যাসকে ক্যান্সারের দূত বলা হয়। ধূমপান, অতিরিক্ত পান খাওয়া, খৈনী খাওয়া, পান মশলা খাওয়া, বেশি মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া, এক্স রশ্মি বা অন্য রশ্মির প্রভাবে বেশি আসা, নানা রকমের কৃত্রিম খাদ্য খাওয়া প্রভৃতিকে ক্যান্সারের জন্য পরোক্ষ দায়ী করা হয়।

যে সব অসুখের কথা বলা হলো বার্ধক্যে সেগুলিই একমাত্র ব্যাধি নয়। এর বাইরের হাজারো রকমের ব্যাধি বার্ধক্যে আসতে পারে। সংক্রামক ব্যাধি, যক্ষা, নার্ভ সংক্রান্ত ব্যাধি, বিশেষ করে নার্ভ-দৌর্বল্য, মানসিক ব্যাধি, চামড়ার অসুখ গ্ল্যাণ্ডের অসুবিধা, চোখ কান গলা দাঁত নিয়ে সমস্যা, সর্বোপরি যে কোন শল্যচিকিৎসার পরবর্তী জটীলতা বৃদ্ধ মানুষদের যথেষ্ট কাহিল করে দেয়। দুর্বল দেহ, দুর্বল মানসিক অবস্থান, দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যে কোন রোগের কাছে ধরাশায়ী করার সুযোগ করে দেয়।

তবু বুড়ো মানুষদের বাঁচতে ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছার সম্মান জানাতে গিয়ে আমাদের তাদের সম্পর্কে আরো একটু সচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত। পাশাপাশি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও নিজপক্ষ থেকে কতগুলি ব্যবস্থা নিতে হবে, জীবন-যাপনের একটা পদ্ধতি বের করে নিতে হবে। এর অনেকটাই একটা দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ। এবার সে কথাটাই আলোচনা করবো।

বুড়ো মানুষ—প্রাজ্ঞ মানুষ

বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলে। কথাটা এক দিক থেকে ঠিক, আবার অন্য দিক থেকে ঠিকও নয়। যদি শারীরিক অক্ষমতা, পরনির্ভরশীলতা বোঝায় তাহলে বলতে হয়—শিশু আর বৃদ্ধে বিশেষ ফারাক নেই। বাহ্যিক প্রকৃতিতেও খানিকটা মিল দেখি আমরা। কেশবিহীন, দন্তবিহীন, অস্পষ্ট কথাবার্তা এসবে অভিন্নতা আছে।

আবার অমিলও আছে। বৃদ্ধের আছে অতীত, শিশুর আছে ভবিষ্যৎ। বৃদ্ধের জীবন শেষ হতে চলেছে, শিশুর তা শুরু হয়েছে। বৃদ্ধের বিপুল অভিজ্ঞতা আছে, আর সেখানে শিশুর ভাণ্ডার শূন্য, তার কেবল আছে অপরিসীম কৌতূহল।

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধকে এমন গুণে গুণী করে যা অতুলনীয়। এই প্রশ্নে বার্ধক্যকে কখনই দ্বিতীয় শৈশব বলা যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে—এই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কি বার্ধক্যে কোন কাজে লাগে ? অনেকেই বলবেন—অন্তত "কাজ" বলতে যদি বাস্তবমুখীন, অর্থকরী ও প্রয়োগজনিত কাজ বোঝায় তাহলে বৃদ্ধের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সচারচর তেমন কাজে লাগে না। অনেকে তো বটেই, এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেরাই এই বলে ভাবতে থাকেন যে তারা সংসারে উদ্বৃত্ত, অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি। ভাবেন সংসারে রান্নাবান্না, একটু আধটু বাজার-হাট, নাতি-নাতনীদের সামলানো—নিদেন পক্ষে বাড়িতে থাকাটার মতো "সামান্য" কাজে তাদের প্রয়োজন হয়, নচেৎ কি মূল্য আছে তাঁদের ?

এই এক হতাশা বুড়ো মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই এক ভাবনা— আমরা সংসারে অপাঙ্ক্তেয়। তার উপর যদি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অর্থনৈতিক জোর না থাকে তাহলে তো কথাই নেই— সমস্যা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

হতাশা–আরো হতাশা মানুষকে আরো অথর্ব আরো রোগগ্রস্ত করে তোলে। মানসিক অবসাদ ক্রমশ জমতে থাকে। মনে হয়, যে জীবন অনর্থক তাকে আর টেনে বেড়ানো কেন! পুঞ্জীভূত বেদনা, অভিমান আর হতাশার সঙ্গে বার্ধক্যজনিত ব্যাধি একদিন জীবনের অবসান ঘটায়।

কিন্তু এই হতাশার কি কোন বাস্তবতা আছে? কোন ভিত্তি আছে? সমাজ-সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বলতেই বা আমরা কি বুঝি? যে কাজের "অর্থকরী" মূল্য নেই তা কি সত্যি কোন কাজ নয়? মানুষের সভ্যতার উপাদান হিসাবে তার কি একেবারেই মূল্য নেই?

মানুষ যতদিন চাকরীতে থাকে বা পেশায় যুক্ত থাকে ততদিন সে সমাজের জন্য কিছু করছে মনে করে। যে বড়বাবু সে ভাবছে যে তার পরিচালনায় চলছে একটা বড় দপ্তর। যে পিয়ন সেও তার গুরুত্ব বোঝে। পেশাদারীরা, তা সে ডাক্তার হোক বা উকিল হোক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হোক–তারাও তাদের কাজের গুরুত্ব বোঝে, সমাজে তাদের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝে। রাজনীতিবিদ, আমলা, শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবীরা তো সমাজের চূড়ায়! তাঁরা ভাবেন– তাঁদের অভাবে সমাজ তো কোন্ ছার, বিশ্বও অচল।

এহেন ভাবাভাবিতে খুব একটা ভুল দেখি না। সত্যিই তো, প্রতিটি কর্মময় মানুষের সমাজে একটা-না-একটা ভূমিকা থাকে। ছোট হোক, বড় হোক– সবাই আপন আপন ক্ষেত্রে রাজা।

এখন কথা হচ্ছে, মানুষ যখন অবসর গ্রহণ করে–তা সে চাকরী থেকে হোক, কিংবা স্বনিযুক্তি ক্ষেত্র থেকেই হোক– হঠাৎ তার স্বর্গ থেকে পতন হয়। যে ক'দিন আগেও নিজ ক্ষেত্রে নিজেকে রাজা মনে করতো সে হঠাৎ ফকির হয়ে গেল। হঠাৎই সে দেখল, তার চারপাশের কাজের জগত অন্তর্হিত হয়েছে। একটা বিরাট শূন্যতা এসে তাকে গ্রাস করে ফেললো।

এতকাল নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে নিজেকে মেলে না ধরার অভ্যাস তাকে গভীর সমস্যায় ফেলে। নিজের অতিপরিচিত জগতের বাইরে যে জগতটা আছে তার সম্পর্কে মানুষ সাধারণত কতটুকু খবর রাখে?

আজকাল দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। এমনকি, যে সব অঞ্চল শহর নয়, সেখানেও শহুরে মানসিকতা ঢুকছে। অতি-ব্যস্ত এমন

পরিবেশে আমরা এমনকি প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বা কতটুকু সংবাদ রাখি ? পাড়ার লোকেদের কি ভালোভাবে চিনি ? এলাকার নানা সমস্যা সর্ম্পকে হয়তো ভাসা-ভাসা কিছু জানি, কিন্তু জানি কি সেই সমস্যাগুলির উৎস কোথায় ? পাড়ার ক্লাব, লাইব্রেরী, নাগরিক সঙ্ঘ, সর্বজনীন পূজা কমিটিগুলিতে কি কোনদিন অংশগ্রহণ করেছি ? কোনদিন কি তেমন ভাবে পাড়ায় আড্ডা জমিয়েছি ?

এ সব প্রশ্নের উত্তর মোটামুটিভাবে একটাই পাওয়া যাবে–না। তাহলে অবসরগ্রহণের পর আমি মনুষ্যসঙ্গবঞ্চিত হবো না তো কে হবে ?

এটা মূলত এক শ্রেণীর জীবনদর্শন। জীবনকে দেখা ও বোঝার পদ্ধতি সবাকার এক নয়। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের শারীরিক ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ, সে জোরে ছুটতে পারে না, তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি বা ঘ্রাণশক্তি নেই, এমন দাঁত-নখ নেই যা দিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যেতে পারে।

যূথবদ্ধ হয়ে তাই মানুষকে বাঁচতে হয়েছে, একের সাহায্যে অন্যকে। সামাজিক জীবন তাই মানুষের বাঁচার পক্ষে অপরিহার্য। পাশাপাশি তাকে সাহায্য করেছে বুদ্ধি। সামাজিক জীবনের সুবিধা এবং বুদ্ধি–এই দুইয়ের সহায়তায় মানুষ গড়েছে তার সভ্যতা।

চারপাশে দেখলে মনে হয়, আমরা সামাজিক পরিচয়ের থেকে বৌদ্ধিক পরিচয় দিতে ইদানিং বেশি ভালবাসছি। নগরায়ন, শিল্পায়ন, কর্মব্যস্ত ও প্রতিযোগিতামূলক জীবন আমাদের প্রত্যেককে "ব্যক্তিতে" রূপান্তরিত করেছে। ধনবাদী ও ভোগবাদী (কনজুমারিজম) সভ্যতার এটাই দান। আমরা যে সমষ্টির অংশ তা ভুলতে বসেছি।

এসবের জন্য নানা ক্ষতি আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। কাজের পাহাড়ের মধ্যে বাস করে একটু একা হতে ভালো লাগে। সপ্তাহান্তে একটু অবসর, নিজের মতো থাকা অথবা বৎসরান্তে ছুটি কাটানো, সমুদ্র বা পাহাড়বিলাস ভালোই লাগে। কর্মব্যস্ততা থেকে কিছুক্ষণের মুক্তি প্রাণের ও মনের আরাম এনে দেয়।

কিন্তু যখন সত্যিই অবসর আসে সে অবসরকে উপভোগ করার কি মানসিকতা আমাদের থাকে ? অবসরের দিনগুলিতে কাজের লোকের বদলে গল্প করার লোক খুঁজি । কিন্তু খুঁজলেই

কি পাওয়া যায় ? হয়তো প্রাতর্ভ্রমণের সময় অথবা পার্কের বেঞ্চিতে সমবয়সী মানুষদের সঙ্গে কিছুটা আড্ডা হয়, কিন্তু সে আড্ডা তেমন বর্ণাঢ্য হয় না; বিবর্ণ হতাশ কতগুলি মানুষ কি বর্ণময় জগতের সন্ধান দিতে পারে ?

যে মানুষ সত্যি সত্যি কর্মময় জীবনের মধ্যে আর একটা জীবন, অর্থাৎ সামাজিক জীবন, সৃষ্টিময় জীবন তৈরি করতে পেরেছে–অবসর তার কাছে কোন সমস্যা নয় । যিনি মধ্য বয়স থেকে নিজ বাসস্থানের এলাকায় সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত, যিনি অনেকদিন ধরে মানুষকে নিয়ে গঠনমূলক কাজে অভ্যস্ত অথবা যিনি নিজের মতো করে সৃষ্টিশীল কোন কাজ খুঁজে নিতে পেরেছেন– সমাজ তার কাছে এগিয়ে আসে । বৃদ্ধ বয়সের অন্যতম অভিশাপ নিঃসঙ্গতা তার লাগে না ।

দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভের জন্য আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে, এ কথা অনেকেই বলেছেন । কিন্তু সেই আশার উৎপত্তিস্থল কোথায় ? অবশ্যই কম বয়সীরা, তরুণ তরুণীরা চিরকাল আশাবাদী–সামনে তাদের জীবন পড়ে আছে, তারা আশা করবে না তো কে করবে ? সমাজের তরুণ-তরুণীরা হয়তো কিছুটা অনভিজ্ঞ, হয়তো কিছুটা চঞ্চল, হয়তো তারা গুরুজনদের সামনে যথোচিত আচরণ সব সময় করে না তবু তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ । এদের সঙ্গে বৃদ্ধরা-বয়স্করা যদি মেলামেশা করেন, যদি এদের সঙ্গে কাজে-কর্মে যুক্ত হয়ে যান তাহলে অবশ্যই তরুণ-তরুণীর প্রাণের পরশ কিছুটা বয়স্কদের মনে লাগবে । এই যে দেওয়া-নেওয়া তাতে তরুণরা নিশ্চয় উপকৃত হবে, তবে সবচেয়ে উপকৃত হবেন বয়স্করা, তাঁরা বেঁচে যাবেন ।

লাইব্রেরী, ক্লাব, খেলাধূলা, সংস্কৃতি, এলাকায় উন্নয়ন ও ভালোমন্দ–নানা কাজের সঙ্গে তো বৃদ্ধেরা যুক্ত হতে পারেন । দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগ এই সংস্থাগুলির সাহায্যে আসে । খ্যাতি, অর্থ–এগুলি বড় নয়, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারাটাই তখন বড় হয়ে ওঠে ।

পশ্চিমী উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসরজীবন যাপনের নানা রূপরেখা পাওয়া যায় । সম্মীলিত ব্যায়াম, ভ্রমণ, আনন্দ উল্লাস থেকে শুরু হয় তাদের সামাজিক জীবন । কখনো বয়স্করা একত্রে, কখনো মিশ্র বয়সীদের সঙ্গে একত্রে তাঁরা নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন । হাজারো রকমের সখের সাথী

হন–এদের অনেকগুলির সামাজিক চরিত্র আছে। মনে রাখা দরকার, বৃদ্ধ বয়সে মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকতে হলে একটি পরিচ্ছন্ন সামাজিক জীবনের অংশীদার হতে হবে।

মানুষ তো সারা দিন সামাজিক জীব হয়ে বাস করতে পারে না। এমন কি যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে এত কথা বলা হলো তারও কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। সমাজের যে ছোট্ট রূপ, অর্থাৎ পরিবার, সেখানে তাদের ফিরে আসতে হয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ মানুষের আশ্রয়স্থল হলেও পরিবার মানুষের কাছের আশ্রয়স্থল। পরিবারের মানুষজন, অর্থাৎ ছেলে, মেয়ে পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনীরা বুড়ো-বুড়িদের আপনজন। দীর্ঘকালের মূল্যবোধ, ভালোবাসা, আকর্ষণ, স্নেহ, মমতা, প্রীতি দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে–এই সম্পর্ক দিয়েছে সান্ত্বনা, নিরাপত্তা। শিশুদের মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও অসহায়, তাদেরও চাই নিরাপত্তা, নিরাপত্তা দিতে পারে পরিজনেরা।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি, আজকালকার পরিবারগুলি দ্রুত ভাঙনের মুখে। পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, বাপ-মায়ের খোঁজ তারা রাখছে না।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ব্যাপক আধুনিকীকরণ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ প্রভৃতি মানুষকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে পরিবারের মধ্যেও তা প্রবেশ করছে এবং পরিজনদের বিভক্ত করে দিচ্ছে। এক ধরণের স্বার্থপরতা দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করছে। এই ভাঙনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

পরিস্থিতি এমন হচ্ছে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর স্নেহের বাঁধনে স্নেহাস্পদদের বেঁধে রাখতে পারছেন না। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রাধান্য বিস্তার করছে স্নেহের উপর।

শান্তির নীড়গুলি একে একে ভেঙ্গে পড়ছে। টেনসন, ঠেস দিয়ে কথাবার্তা, নিজের পক্ষে কান ভাঙানো– পারিবারিক নাটকগুলিতে অহরহ দেখা দেয়। কখনও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, বিশ্রী কলহ চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘরের শান্তিতো বটেই,

এমনকি প্রতিবেশীদের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

কখনও নিছক স্বার্থের কারণে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে উপার্জনশীল পুত্র-পুত্রবধূরা সম্পর্ক রাখে। ছোট বাচ্চাদের দেখাশুনা করা অথবা স্বামী-স্ত্রী কাজে গেলে ও বাচ্চারা স্কুলে গেলে বাড়ি পাহারা দেওয়া, রান্না-বান্নার কাজ দেখা, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া আসা করা অথবা বাজার-হাট করানোর জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সংসারে স্থান পান।

এ কথা বলার এই অর্থ নয় যে আজকালকার কোন পরিবারে বৃদ্ধ পিতা মাতা বা আত্মীয়সূত্রে অন্য বৃদ্ধ মানুষেরা মর্যাদার সঙ্গে, স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে বাস করতে পারেন না। এখনও এমন পরিবার দেখা যায় যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা বজায় রাখা হয়, বয়স্ক সম্মানীয়দের প্রতি যথোচিত আচরণ করা হয়। নিছক স্বার্থবোধ দ্বারা নয়, পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ দ্বারা এসকল পরিবারের সদস্যরা পরিচালিত হন।

পারিবারিক পরিবেশ যেমন হোক না কেন– বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। যাদের অর্থকরী জোর নেই, শারীরিক অসুবিধা আছে তাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, মানিয়ে চলতে তারা বাধ্য হয়। এ সব সমস্যা না থাকলেও স্নেহের বন্ধনে, বার্ধক্যের অসহায়তার কারণে বেশির ভাগ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরিবারের বাকি সদস্যদের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই আত্মসমর্পণ সব সময় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি এনে দিতে পারে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনে শান্তির গুরুত্ব অনেক। কথায় বলে– সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। বৃদ্ধ বয়সে সুখ আমোদ আহ্লাদের থেকে স্বস্তি শান্তি অনেক ভালো, অনেক কাম্য।

অশান্তি অস্বস্তির পিছনে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রায়শই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের তরুণ সদস্যদের, ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ জামাতাদের, এমনকি নাতি নাতনীদের কার্যকলাপ হামেশাই বৃদ্ধরা পছন্দ করেন না। যুগগত পরিবর্তনের কারণে অনেক কিছু পাল্টে যায়। রুচি, মানসিকতা, ঝোঁক, অভ্যাস এমনকি মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসে। হয়তো দেখা গেল, নাতনীরা যে সাজপোশাক করছে দাদুর তা অপছন্দ, পুত্রবধূ যেভাবে বাচ্চা মানুষ করে দিদিমার শিক্ষার তার কাজে লাগে না, রান্না-বান্না ব্যাপারেও প্রজন্ম ভেদে ঘোর অমিল দেখা দেয়।

শুধু কি ঘর সংসরের ব্যাপার ? গরমিল যেন সব জায়গায় ।

রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের পদ্ধতি, বেড়াতে যাওয়ার স্থান নির্বাচন থেকে শুরু করে খাওয়ার অভ্যাস, রুচি, গান শোনার পছন্দ-অপছন্দ, টিভি ভিসিআর প্রীতি বা তাকে সর্বনাশা ভাবা—সব কিছু নিয়ে সেই দ্বন্দ্ব ।

আর যাই হোক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পৃথিবী বদলে গিয়ে নবীনদের পৃথিবী এসেছে । তাই নতুন যুগের নতুন ব্যাপারগুলিকে মেনে নিতে পারলে সব থেকে ভালো হয় । যদি মেনে নেওয়া না যায় তবে অন্তত দ্বন্দ্বগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ । যা পছন্দ হলো না তাকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে, তা নিয়ে মতান্তর বা মনান্তর না ঘটিয়ে শান্তভাবে এড়িয়ে যাওয়াটাই ভালো । নিজের মত জানিয়ে অন্যের মত শুনে প্রসঙ্গ শেষ করাটা কাম্য ।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন । তাদের স্নেহাস্পদরা যে আর ছোট নেই, তারাও যে যথেষ্ট যোগ্য, বুদ্ধিমান, বিবেচক ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, তা খেয়াল রাখা উচিত । উপদেশ দেওয়া বা পরিচালনা করার চেষ্টা না করাই ভালো । বরং সাহায্য পরামর্শ চাইলে তা দেওয়া যেতে পারে, উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না । মনে রাখতে হবে, অযাচিত উপদেশ বিড়ম্বনা ডেকে আনে । কনিষ্ঠদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ সর্বদা প্রার্থিত । কিন্তু সে আচরণও বিপদ আনতে পারে যদি তা অত্যন্ত ব্যক্তিগতস্তরে চলে যায় । কোথায় শুরু করতে হবে আর কোথায় থামতে হবে তা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে ।

বৃদ্ধাদের বিশেষ করে পুত্রবধূদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া চাই । দৈনন্দিন সংসার পরিচালনার ব্যাপার বা বাজার কি হবে কি রান্না হবে সে ব্যাপারে পুত্রবধূ বা কন্যাদের মতামতকে প্রাধান্য দিলে ভালো হয় ।

মোট কথা, সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কিছুটা আলাদাভাবে থাকা, কিছুটা আলগাভাবে থাকা, কিছুটা নিজের মনোজগতে থাকার প্রয়োজন আছে । বোঝা দরকার, জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে সম্মান নিয়ে সুস্থভাবে বাঁচাটাই কাম্য । সংসার নামক বিরাট কর্মযজ্ঞে তার দিন অবসান । এটা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে ততই মঙ্গল ।

পরিজনরা যখন অবহেলা করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রায় ত্যাগ করে তার থেকে দুঃখের আর কিছু নেই । আর্থ-সামাজিক

কারণগুলি দূর করা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়, এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে চলছে এমন পরিজনকে নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব। এ অবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কিই বা করতে পারেন ? দুঃখ পাওয়া ছাড়া তাদের আর কিই বা করার আছে ?

দুঃখকে এড়ানো না গেলেও তাকে সহ্য করার ক্ষমতাকে অবশ্য অর্জন করতে হবে। পরিবার যদি শান্তির জায়গা না হয় তবে অন্তত কিছুটা স্বস্তি খুঁজতে হবে আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে—পড়শীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে। আর যাই হোক, আঘাত যেন হতাশ করে না তোলে, আঘাতের মধ্য দিয়ে আরো সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে হবে—এটাই হবে আমাদের সাধনা।

শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের মানসিক গঠনটা একটা জরুরী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অর্থকষ্ট বা শারীরিক অসাচ্ছন্দ্য—এই দুই বৈরীতা না দেখা দিলে মানুষের বৃদ্ধ বয়সে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তার মন। দীর্ঘজীবনের অভ্যাস, মানসিকতা, অহংবোধ এক সময় নানা সমস্যা তৈরি করে।

অবসর জীবনযাপনের জন্য, বৃদ্ধের জীবনযাপনের জন্য এক ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। এই প্রস্তুতি এক দিনে তৈরি করা যায় না। তার জন্য অবসর নেবার অনেক আগে থেকে, বৃদ্ধ হবার অনেক আগে থেকেই তৈরি হতে হয়।

মনে রাখতে হবে, প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যের পূর্বাবস্থা, অবসর গ্রহণের পূর্বকালীন সময়। এই সেই সময় যখন মানুষকে জীবনে কি পারলাম আর পারলাম না তার হিসাব কষে বাকি দিনগুলির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

যৌবনে মানুষ যখন তীব্রভাবে জীবনযাপন করে তখন এরূপ ভাবনাচিন্তার অবকাশ থাকে না, মানসিকতা বা অভিজ্ঞতাও থাকে না। সংসারের রূপরেখাটাও পরিষ্কার থাকে না। কাজে কাজেই, তুলনামূলকভাবে, পরিণত বয়সে অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বে মানুষ গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তার করার সুযোগ পায়।

অবসর জীবনে সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্বের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার ব্যাপারটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একা নিজের মনে থাকার কথা বলেছি। একা নিজের মনে থাকা খুব একটা সহজ কাজ নয়। যাঁরা অভ্যাস করেনি তাঁরা হাঁপিয়ে উঠবেন, একা থাকাটা একাকীত্ব বলে মনে হবে, নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে।

নিজের মনে থাকা, অর্থাৎ বই পড়া, চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া, গান শোনা, সকাল বিকাল হাল্কা পদচারণা করা, বাগান করা, লেখালিখি করা, এ সব চাইলেই সব মানুষ পারে না। তার জন্য অভ্যাস চাই। হবি বলে ইংরাজীতে যে কথাটা আছে তার গুরুত্ব বৃদ্ধ বয়সে বোঝা যায়।

মুশকিল হচ্ছে, আমরা সারা জীবনে হবি তৈরি করি না, কেবল কাজ করি। কেজো হয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। বাড়ি গাড়ি করে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়িয়ে, মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়ে, ছেলেদের উচ্চচাকুরে ও কৃতী বানিয়ে আমরা নিজেদের মহাসার্থক ভাবি। কিন্তু সত্যি কি তাই? সংসারে দায় দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন করতে হবে, কিন্তু কেউ যদি সেখানেই সব কিছুর শেষ দেখেন তাহলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে হতাশ হতে হবে।

একটা ব্যাপার অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আমাদের চারপাশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বেশির ভাগ বেশ হতাশ। সমাজ সম্পর্কে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ, সংসার পরিজন সম্পর্কে অনুযোগের পর অনুযোগ—এই তো ছবি!

নিজের – একান্তভাবে নিজস্ব কিছু কাজ, যা সে অর্থে কাজ নয়, বরং অকাজ, তার মধ্যে নিজেকে কিছুটা মেলে ধরা দরকার।

সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মানুষ প্রৌঢ় বয়সেই হবির প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করে। এই সেই বয়স যখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যায়, নিজেদের মতো করে তারা চলতে পারে, এই সেই বয়স যখন জীবনে স্থিতি আসে। হঠাৎ করে মানুষ একদিন অনুভব করে— তার চারপাশের সব কিছু কেমন যেন আলগা হয়ে আসছে। মুস্কিল হয়--এই বয়সে অনেকে আবার সংসার-কর্মযজ্ঞে বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে, নিজের ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি (যা এই বয়সে স্বাভাবিক) লক্ষ্য করে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পড়শি ও আত্মীয়দের আর্থিক সৌভাগ্যে কিঞ্চিত ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। এ সব যদি হয়,

তাহলে তখনই সাবধান হওয়া দরকার।

আর কিছু না হোক, এই যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া বা দুশ্চিন্তা করা তাতে স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হয়, এমন কি হঠাৎ স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রৌঢ় বয়সের কর্মচাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে নানাভাবে বিপর্যয় আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, তখন স্বাস্থ্য ভাঙ্গনের পথ ধরছে। কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। যৌবনের কর্মক্ষমতা ও আগ্রহ তখনও যথেষ্ট পরিমানে মানুষের মধ্যে রয়েছে। এই দুই বিপরীত অবস্থানকে এক সঙ্গে সামাল দেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়।

সব চেয়ে ভালো হয়, যদি উচ্চাশাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের ভালোলাগা ও ভালোবাসাকে মূল্য নিয়ে নিজের মতো করে কিছু কাজ করা যায়। নিজের পছন্দ মতো কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা বা লেখা শুরু করা যায়। কেউ কেউ সখের চিত্রশিল্পী হন, কেউ আলোকচিত্রশিল্পী হন। কেউ বাগান করেন– বিশেষ করে ফুলের গাছ, শখের হর্টিকালচারিস্ট হন তাঁরা। গান গাইতে না পারুন, গান শোনা যেতে পারে–দু একটা যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা করা যেতে পারে। হাল্কা খেলায় সময় দেওয়া যেতে পারে– আর কেউ না থাকলে স্বামী-স্ত্রী বসে দাবাও খেলতে পারেন। নিছক গল্পগুজবই বা মন্দ কি? স্বামী-স্ত্রী বা পরিবারের বয়স্ক সঙ্গীরা শুধু কাজের কথাবার্তায় থাকবেন কেন, আর পাঁচরকম কথাও তো বলতে পারেন। মনকে সতেজ রাখার এটা একটা বড় মাপের পদ্ধতি। হবির কথা বলে শেষ করা যায় না। ভালো লাগে এমন যে কোন কাজ অর্থ, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির জন্য না করলেই তাকে হবি বলা যাবে। এই হবি শেষ পর্যন্ত মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকেও মানুষ তার ভালোলাগার কাজের মধ্যে সান্ত্বনা পেতে পারে।

মানুষ যে কাজ আনন্দের সাথে করে তার মূল্য অপরিসীম। দেশ ও দশের প্রয়োজন এখানে বড় কথা নয়, মানুষ তার নিজের মুক্তির জন্য এ কাজের প্রতি দায়বদ্ধ। এভাবেই মানুষ তার বেঁচে থাকার স্বাদ পায়, জীবন সম্পর্কে উন্মুখ হয়। জীবনের সার্থকতা বলতে এক-একজন মানুষ এক-একরকম বোঝে। কেউ বোঝে খ্যাতির মধ্যে সার্থকতা। কেউ বোঝে অর্থের মধ্যে সার্থকতা। কিন্তু এই তথাকথিত সার্থকতাগুলি মানুষকে সার্বিক

তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষ যখন শর্তহীনভাবে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করে তখনই সে কেবল কাজের মধ্যে মুক্তি পেতে পারে।

মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধিগুলি পরিচ্ছন্ন হয়, তীক্ষ্ম হয়। জীবন শেষ হবার মুখে মানুষ তার বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে নিতে চায়। বাড়িঘর পরিজন অর্থ প্রতিপত্তি খ্যাতি ছাড়িয়ে মানুষ অন্য কোন জগতে যেতে চায়। বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে সৃষ্টিশীলতা— সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন জগত প্রবাহিত। পৃথিবীতে মানুষ কাজের স্বাক্ষর দিয়ে যায়, বিশ্বের ধারার সঙ্গে মানুষের কর্মধারা মিলিত হয়ে যায়।

বিদ্যা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা — প্রবহমান জীবনের বিভিন্ন পর্বে সংগৃহীত পাথেয়গুলি এইভাবে রূপান্তর হয়। সমস্ত সুখ দুঃখের উর্দ্ধে উত্থিত যে মানুষ গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী হন একমাত্র তার সাহায্যে জীবনের যাবতীয় তাৎপর্যকে অনুভব করা সম্ভব। মানুষ বৃদ্ধ শুধু শরীরে হয়, যথার্থ প্রাজ্ঞ মানুষের বিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ বয়সের হয়তো প্রয়োজন হয়, কিন্তু একমাত্র বয়সই মানুষকে বিজ্ঞতা দান করতে পারে না। প্রাজ্ঞতা অর্জন করার জন্য মানুষকে নিরলস অনুশীলন করতে হয় — এরই নাম বোধহয় জীবনসাধনা। সেই গভীর দার্শনিক অভিব্যক্তি, গভীর জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের সমাজ-সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর, আমাদের একান্ত কাম্য। বৃদ্ধ মানুষ যদি প্রাজ্ঞ মানুষে পরিণত হন তাহলেই তিনি পারেন চারধারের সমস্যাপ্রকটিত পরিবেশে সুস্থভাবে বাস করতে। আনন্দময় সেই বৃদ্ধেরা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রশান্ত থাকতে পারেন।